জাগরণ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—: প্রাপ্তিস্থান :—
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

জাগরণ

এক

ব্যারিস্টার মিস্টার আর এম.রে ব্রাহ্ম ছিলেন না, গোঁড়া হিন্দু ত ছিলেনই না, হয়ত বা আঠারো আনা 'বিলাত ফেরতের জাতি'ও নাও হইবেন; তবে এ কথা সত্য যে, তাঁহার পিতা-মাতা যখন আরাধ্য দেব-দেবী স্মরণ করিয়া সপ্তপুরুষের অক্ষয় স্বর্গকামনায় একমাত্র পুত্রের নাম শ্রীরাধামাধব রায় রাখিয়াছিলেন, তখন অতি বড় দুঃস্বপ্নেও তাঁহারা কল্পনা করেন নাই যে, এই ছেলে একদিন আর এম রে হইয়া উঠিবে, কিংবা তাহার খাদ্য অপেক্ষা অখাদ্যে এবং পরিধেয়ের পরিবর্তে অপরিধেয় বস্ত্রেই আসক্তি দুর্দম হইয়া দাঁড়াইবে। যাই হউক, সেই পিতা-মাতারা আজ যখন জীবিত নাই এবং পরলোকে বসিয়া পুত্রের জন্য তাঁহারা মাথা খুঁড়িতেছেন কিংবা চুল ছিঁড়িতেছেন অনুমান করা কঠিন, তখন এই দিকটা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার যে দিকটায় মতদ্বৈধের আশংকা নাই, সেই দিকটাই বলি।

ইঁহার রাধামাধব অবস্থাতেই বাপ-মায়ের মৃত্যু হয়। কলেরা রোগে সাত দিনের ব্যবধানে যখন তাঁহারা মারা যান, ছেলেকে এন্ট্রান্স পাসটুকু পর্যন্ত করাইয়া যাইতে পারেন নাই। তবে এই একটা বড় কাজ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ছেলের জন্য জমিদারি এবং বহু প্রজার রক্তজমাট-করা অসংখ্য টাকা এবং ইহার চেয়েও বড় এক অতিশয় বিশ্বাসপরায়ণ ও সুচতুর কর্মচারীর প্রতি সমস্ত ভারার্পণ করিয়া যাইবার অবকাশ এবং সৌভাগ্য তাঁহাদের ঘটিয়াছিল। কিন্তু এ-সকল অনেক দিনের কথা। আজ 'সাহেবে'র বয়স পঞ্চাশোর্ধে গিয়াছে, দেশের সে রাজশেখর দেওয়ানও আর নাই, সে-সব দেবসেবা, অতিথি সৎকারের পালাও বহুকাল ঘুচিয়াছে। এখন ইংরাজীনবিস ম্যানেজার এবং সেই সাবেক কালের বাড়ি-ঘরের স্থানে যে ফ্যাশনের বিল্ডিং উঠিয়াছে, মালিক মিস্টার আর এম রে'র মত উহাদেরও পৈতৃকের সহিত কোন জাতীয়ত্ব নাই। অথচ, এই-সকল নবপর্যায়ের সহিতও যে যথেষ্ট সম্পর্ক রাখিয়াছেন, তাহাও নয়। কেবল দূরে হইতে সত্ব নিংড়াইয়া যে রস বাহির হয়, তাহাই পান করিয়া এতকাল আত্ম এবং সাহেবত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। এইখানে তাঁহার কর্মজীবনের আরও দু-একটা পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া আবশ্যক। ব্যারিস্টারি পাস করিয়া বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া তাঁহারই মত আর এক সাহেবে'র বিদুষী কন্যাকে বিবাহ করেন এবং যথাক্রমে অযোধ্যা, প্রয়াগ, বোম্বাই পাঞ্জাবে প্র্যাকটিস করেন। ইতিমধ্যে স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা লইয়া বার-বিলাত যাতায়াত করেন এবং আর যাহা করেন, তাহা এই গল্পের সম্বন্ধে

নিষ্প্রয়োজন। ছেলেটি ত ডিফ্থিরিয়া রোগে শৈশবেই মারা যায়, এবং পত্নীও দীর্ঘকাল রোগভোগের পর বছর-তিনেক হইল নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন সেই হইতে রে সাহেবও প্র্যাক্‌টিস বন্ধ করিয়াছেন। ঐ ঐ স্থানগুলোয় যথেষ্ট-পরিমাণ অর্থ না থাকার জন্যই হউক বা স্ত্রীর মৃত্যুতে বৈরাগ্যোদয় হওয়াতেই হউক, এক সাহেবি-আনা ব্যতীত আর সমস্তই ত্যাগ করিয়া তিনি একমাত্র মেয়েটিকে লইয়া পশ্চিমের একটা বড় শহরে নির্বিঘ্নে বাস করিতেছিলেন। এমনি সময়ে একদিন তাঁহার নিশ্চিন্ত শান্তি ও সুগভীর বৈরাগ্য দুই-ই যুগপৎ আলোড়িত করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নন-কোঅপারেশনের প্রচণ্ড তরঙ্গ একমুহূর্তে একেবারে অভ্রভেদী হইয়া দেখা দিল। হঠাৎ মনে হইল এই ভয়লেশহীন শুদ্ধ শান্ত সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ তপস্যা হইতে যে 'অদ্রোহ অসহযোগ' নিমিষে বাহির হইয়া আসিল, ইহার অক্ষয় গতিবেগ প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই। যেথায় যত দুঃখ-দৈন্য, যত উৎপাত-অত্যাচার, যত লোভ ও মোহের আবর্জনা যুগ-যুগান্ত ব্যাপিয়া সঞ্চিত হইয়া আছে, ইহার কিছুই কোথাও আর অবশিষ্ট থাকিবে না, সমস্তই এই বিপুল তরঙ্গবেগে নিশ্চিহ্ন হইয়া ভাসিয়া যাইবে।

কলিকাতার মেল ক্ষণকাল পূর্বে আসিয়াছে, বাহিরের ঢাকা বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসিয়া রে-সাহেব জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের বিবরণ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় নীচে গাড়িবারান্দায় মোটরের শব্দ শোনা গেল এবং মিনিট-দুই পরেই তাঁহার কন্যা আলেখ্য রায় বাহিরে যাইবার পোশাকে সজ্জিত হইয়া দেখা দিলেন। মেয়েটির রঙ ফরসা নয়; কারণ, বাঙালী 'সাহেবদের' মেয়েরা ফরসা হয় না, কেবল সাবান ও পাউডারের জোরে চামড়াটা পাঁশুটে দেখায়। তবে দেখিতে ভাল। মুখে চোখে দিব্য একটি বুদ্ধির শ্রী আছে, স্বাস্থ্য ও যৌবনের লাবণ্য সর্বদেহে টলটল করিতেছে, বয়স বাইশ-তেইশের বেশী নয়, কহিল —বাবা, ইন্দুর বাড়িতে আজ আমাদের টেনিস টুর্নামেণ্ট, আমি যাচ্ছি। ফিরতে যদি একটু দেরি হয় ত ভেবো না।

'সাহেব' কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি উত্তেজনায় উজ্জ্বল, মুখে আবেগ ও আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে, মেয়ের কথা কানেও যায় নাই। বলিয়া উঠিলেন আলো, এই দেখ মা, কি-সব কাণ্ড! বার বার বলেছি, এ-সব হতে বাধ্য, হয়েছেও তাই।

মেয়ে বাবাকে চিনিত। তাঁহার কাছে সংসারের যাহা কিছু ঘটে, তাহাই ঘটিতে বাধ্য এবং তিনি তাহা পূর্বাহ্নেই জানিতেন। সুতরাং এটা যে ঠিক কোন্‌টা তাহা আন্দাজ করিতে না পারিয়া কহিল—কি হয়েছে বাবা?

বাবা তেমনি উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিলেন—কি হয়েছে? দু'জন নন্-কো-অপারেটার ছাত্রকে ম্যাজিস্ট্রেট ধরে নিয়ে গিয়ে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির জেল দিয়েছে, আরো পাঁচ-সাত-দশজনকে ধরবার হুকুম দিয়েছে, কি জানি, এদেরই বা কি সাজা

হয়। এই বলিয়া একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেই বলিলেন,—আর যা হবে, তাও জানি। খাটুনির জেল ত বটেই এবং এক বছরের নীচেও যে কেউ যাবে না, তাও বেশ বোঝা যায়। এই বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আলেখ্য এ সকল বিষয়ে মনও দিত না, এখন সময়ও ছিল না। আসন্ন টুর্নামেন্টের চিন্তাতেই সে ব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গীহীন, শোকজীর্ণ অকালবৃদ্ধ পিতার আগ্রহ ও আশঙ্কাকেও অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না। পাশের চেয়ারটার হাতলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ছেলে দু'টি কি করেছিল বাবা?

পিতা কহিলেন—তা করেছেও কম নয়। চারিদিকে গান্ধীর নন্-কোঅপারেশন মত প্রচার করে বেড়িয়েছে, দেশের লোককে ডেকে বলেছে, কেউ তোমরা মারামারি কাটাকাটি ক'রো না, কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ ক'রো না, কিন্তু এই অনাচারী, ধর্মহীন, সত্যভ্রষ্ট বিদেশী গভর্নমেণ্টের সঙ্গেও আর কোন সম্পর্ক রেখো না, চাকরির লোভে এর দ্বারে যেয়ো না, বিদ্যের জন্য এর স্কুল-কলেজে ঢুকো না, বিচারের আশায় আদালতের ছায়া পর্যন্ত মাড়িও না।

আলেখ্য কহিল—তার মানে, সমস্ত দেশটাকে এরা আর একবার মগের মুল্লুক বানিয়ে তুলতে চায়।

বে বলিলেন—তা ছাড়া আর কি যে হতে পারে, আমি ত ভেবে পাইনে!

আলেখ্য কহিল—তাহলে এদের জেলে যাওয়াই উচিত। বাস্তবিক, মিছামিছি সমস্ত দেশটাকে যেন তোলপাড় করে তুলেছে।

মেয়ের কথায় পিতা পূর্ণ সম্মতি দিতে পারিলেন না। একটু দ্বিধা করিয়া বলিলেন,—না, ঠিক যে মিছামিছি করছে তাও নয়, গভর্ণমেণ্টেরও অন্যায় আছে।

আলেখ্য গভর্নমেণ্টের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই প্রায় জানিত না। খবরের কাগজ পড়িতে তাহার একেবারে ভাল লাগিত না, দেশ বা বিদেশের কোথায় কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, এ লইয়া নিজেকে নিরর্থক উদ্বিগ্ন করিয়া তোলার সে কোন প্রয়োজন অনুভব করিত না। সম্মুখের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, তখনও তাহার মিনিট-দশেক সময় আছে, বাবাকে একলা ফেলিয়া যাইবার পূর্বে কোন কিছু একটা অছিলায় এই স্বল্পকালটুকুও তাঁহাকে সঞ্জীবিত ও সচেতন করিয়া যাইবার লোভে কহিল - বাবা, মুখে তুমি যাই কেন না বল, ভেতরে ভেতরে কিন্তু তুমি এই সব লোকদেরই ভালোবাসো। এই যে সেদিন হরতালের দিন ইন্দুদের মোটরের উইণ্ডস্ক্রীনটা ইঁট মেরে ভেঙ্গে দিলে, তুমি শুনে বললে এ-রকম একটা বড় ব্যাপারে ও-সব ছোটখাটো অত্যাচার ঘটেই থাকে। গাড়িতে ইন্দুর বাবা ছিলেন, ধর, যদি ইঁটটা তাঁর গায়েই লাগতো?

কন্যার অভিযোগে পিতা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—না না, আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ আলো। এই সব দুরন্তপনা আমি মোটেই পছন্দ করিনে এবং

যারা করে তাদের শাস্তি দিতেই বলি। কিন্তু তাও বলি, মিস্টার ঘোষের সেদিন গাড়িতে না বার হওয়াই উচিত ছিল। দেশে এতগুলো লোকের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করাই কি ভাল মা ?

আলেখ্য রাগ করিয়া কহিল - অনুরোধ করলেই হ'ল বাবা ? বরঞ্চ, আমি ত বলি, অন্যায় অনুরোধ যেদিক থেকেই আসুক, তাকে অগ্রাহ্য করাই যথার্থ সাহস। এ সাহস তাঁর ছিল বলে তাঁকে বরঞ্চ ধন্যবাদ দেওযাই উচিত।

রে সাহেব সামান্য একটুখানি উত্তেজনার সহিত প্রশ্ন করিলেন—এ অনুরোধ অন্যায়, এ তুমি কি করে বুঝলে আলো ?

আলেখ্য কহিল—তাঁর নিজের গাড়িতে চড়বার তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। নিষেধ করাই অন্যায়।

তাহার পিতা বলিলেন - এটা অত্যন্ত মোটা কথা মা।

কন্যা কহিল মোটা কথাই বাবা, এবং এই মোটা কথা মেনে চলবার বুদ্ধি এবং সাহসই যেন সংসারে বেশী লোকের থাকে। সেদিন গাড়ির এই কাঁচভাঙ্গা লইযা ইন্দুদের বাটীতে যে-সকল তীক্ষ্ম ও কঠিন আলোচনা হইয়াছিল, সে-সকল আলেখ্যের মনে ছিল, তাহারই সূত্র ধরিয়া কণ্ঠস্বর তাহার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তিনি কিছুই অন্যায় করেন নি, বরঞ্চ যে-সব ভীতু লোক ভয়ে ভয়ে এই-সব স্বদেশী গুণ্ডা-দের প্রশ্রয় দিয়েছিল, তারাই ঢের বেশী অন্যায় করেছিল বাবা, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলছি।

সাহেবের মুখ মলিন হইল। কিন্তু আলেখ্যেরও চক্ষের পলকে মনে পড়িল, তাঁহার পিতা অসুস্থ শরীরেও সেদিন সকালে পায়ে হাঁটিয়া ডাক্তারখানায় গিয়েছিলেন এবং ডাক্তারের বারংবার আহ্বান সত্ত্বেও তেমনি হাঁটিয়াই বাটী ফিরিয়াছিলেন। পাছে তাহার তীক্ষ্ম মন্তব্য ঘুণাগ্রেও পিতার কার্যের সমালোচনার মত শুনাইয়া থাকে, এই লজ্জায় সে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তাহার ভগ্নস্বাস্থ্য দুর্বলচিত্ত পিতাকে সে ভাল করিয়াই জানিত। দেহের ও মনের কোনদিন কোন তেজ ছিল না বলিয়া তিনি সংসারে সকল সুবিধা পাইয়াও কখনও উন্নতি করিতে পারেন নাই। শত্রু-মিত্র অনেকের কাছে, বিশেষ করিয়া নিজের স্ত্রীর কাছে অনেকদিন অনেক কথাই এই লইয়া তাঁহাকে শুনিতে হইয়াছে, ফলোদয় কিছুই হয় নাই। এমনি ভাবেই সারা জীবন কাটিয়াছে,—কিন্তু সেই জীবনের আজ অপর প্রান্তে পৌঁছিয়া মেয়ের মুখ হইতে সেই সকল পুরানো তিরস্কারের পুনরাবৃত্তি শুনিলে দুঃখের আর বাকী কিছু থাকে না।

আলেখ্য তাড়াতাড়ি পিতার কাছে আসিয়া কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিল—কিন্তু তাই বলে তুমি যেন ভেবো না বাবা, তোমার কোন কাজকে আমি অন্যায় মনে করি।

পিতা একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার কোন্ কাজ মা ? সেদিন-

কার নিজের কথা তাঁহার মনেও ছিল না।

মেয়ে বাপের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল কোন কাজই নয় বাবা, কোন কাজই নয়। অন্যায় তুমি যে কিছু করতেই পারো না। তবুও তোমাকে যারা সেদিন অসুখ শরীরে ডাক্তারখানায় হেঁটে যেতে-আসতে বাধ্য করলে, বল ত বাবা, তারা কতখানি অন্যায় অত্যাচার করেছিল।

সাহেবের ঘটনাটা মনে পড়িল। তিনি সস্নেহে মেয়ের মাথার উপর ধীরে ধীরে হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন—ওঃ, তাই বুঝি তাদের ওপর তোর রাগ আলো?

এই পিতাটিকে ভুলাইতে আলেখ্যের কষ্ট পাইতে হইত না। সে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে কহিল—রাগ হয় না বাবা?

বাবা হাসিয়া বলিলেন—না মা, রাগ হওয়া উচিত নয়, বরঞ্চ সে আমার বেশ ভালই লেগেছিল ছোট-বড় উঁচু-নীচু নেই, সবাই পায়ে হেঁটে চলেছে, পা যে ভগবান দিয়েছেন, তার ব্যবহারে যে লজ্জা নেই, এ কথা সেদিন যেমন অনুভব করেছিলাম মা, এমন আর কোনদিন নয়। বহুকাল এ কথা আমার মনে থাকবে আলো।

ইহা যে কোন যুক্তি নয়, আলেখ্য তাহা মনে মনে বুঝিল, তথাপি এই লইয়া আর নূতন তর্কের সৃষ্টি করিল না। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিতেই কহিল—চল না বাবা, আজ আমাদের টুর্নামেণ্ট দেখতে যাবে। ইন্দুর মা যে কত খুশী হবেন, তা আর বলতে পারিনে।

পিতাকে কোনকালেই সহজে বাটীর বাহির করা যাইত না, বিশেষ করিয়া তাহার মায়ের মৃত্যুর পর। ঘর এবং এই ঢাকা বারান্দাটি ধীরে ধীরে তাঁহার কাছে সমস্ত পৃথিবীতে পরিণত হইয়েছিল। জড়তায় দেহ ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কোথাও বাহির হইবার প্রস্তাবেই তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইত। মেয়ের কথায় ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন— এখন? এই অসময়ে?

মেয়ে হাসিয়া বলিল—এই ত বেড়াতে যাবার সময় বাবা।

কিন্তু আমার যে বিস্তর চিঠি লেখবার রয়েছে আলো! তুমি বরঞ্চ একটু শীঘ্র শীঘ্র ফিরো, যেন অধিক রাত না হয়, আমি ততক্ষণ হাতের কাজগুলো সেরে ফেলি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সংবাদপত্রে মনঃসংযোগ করিলেন।

এই মেয়েটির ক্ষুদ্র জীবনের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইখানে দেওয়া প্রয়োজন। আলেখ্য নামটি মা রাখিয়াছিলেন বোধ করি নূতনত্বের প্রলোভনে। হয়ত এমন অভিসন্ধিও তাঁহার মনে গোপনে ছিল, হিন্দুদের কোন দেবদেবীর সহিতেই না ইহার লেশমাত্র সাদৃশ্য কেহ খুঁজিয়া পায়; কিন্তু পিতা প্রথম হইতেই নামটা পছন্দ করেন নাই, সহজে উচ্চারণ করিতেও একটু বাধিত, তাই- মেয়েকে তিনি ছোট করিয়া আলো বলিয়াই ডাকিতেন। এই সোজা নামটাই তাহার ক্রমশঃ চারিদিকে

প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। ইন্দুদের সহিত তাহার পরিচয় ছেলেবেলার। ইন্দুর মা ও তাহার মা স্কুলে একত্রে পড়িয়াছিলেন, কিছুকাল এক বোর্ডিঙে বাস করিয়াছিলেন এবং আমরণ অতিশয় বন্ধু ছিলেন। ইন্দুর দাদা কমলকিরণ যখন বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িতে যায়, তখন এই শর্তই হইয়াছিল যে সে পাস করিয়া ফিরিলে তাহারই হাতে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। বছর-খানেক হইল কমলকিরণ পাশ করিয়া কে কে ঘোষ হইয়া দেশে ফিরিয়াছে, তাহার পিতা-মাতা মৃত-পত্নীর প্রতিশ্রুতিও বার-কয়েক রে সাহেবের গোচর করিয়াছেন, কিন্তু এমনি দুর্বলচিত্ত তিনি যে, হাঁ কিংবা না, কোনটাই অদ্যাবধি মনস্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইন্দুদের বাটীতে টুর্নামেন্ট দেখিবার নিমন্ত্রণমাত্রই কেন যে তিনি অমন করিয়া আপনাকে খবরের কাগজের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া ফেলিলেন, ইহার যথার্থ হেতু মেয়ে যাহাই বুঝুক, ইন্দুর মা শুনিলে তাহার অন্যপ্রকার অর্থ করিতেন। তথাপি আলেখ্যকে বধূ করিবার চেষ্টা হইতে তিনি এখনও বিরত হন নাই। তাহার মত মেয়ে রূপে গুণে দুর্লভ নয় তিনি জানিতেন, কিন্তু রোগগ্রস্ত পিতার মৃত্যুর পরে যে সম্পত্তি তাহার হস্তগত হইবে, তাহা যে সত্যই দুর্লভ, ইহাও তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। অন্যপক্ষে পাত্র হিসাবে কমলকিরণ অবহেলার সামগ্রী নহে। সে শিক্ষিত রূপবান, পিতার জুনিয়ারি করিতেছে,—ভবিষ্যৎ তাহার উজ্জ্বল। মা কথা দিয়াছিলেন, আলেখ্য তাহা জানিত। ইন্দু ও তাহার জননী যখন-তখন তাহা শুনাইতেও ত্রুটি করিতেন না। সকলেই প্রায় একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, অল্পবুদ্ধি বৃদ্ধের মনস্থির করিতে বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু স্থির যখন একদিন করিতেই হইবে, তখন এদিকে আর নড়চড় হইবে না। প্রমাণস্বরূপে তিনি আলেখ্যের সুমুখেই তাঁহার স্বামীকে বলিতেন, সন্দেহ করবার আমি ত কোন কারণ দেখিনে। অমত থাকলে মিঃ রে কখনও আলোকে এমন একলা আমাদের বাড়ি পাঠাতেন না। মনে মনে তিনি খুব জানেন, তাঁর মেয়ে আপনার বাড়িতে আপনার লোকজনের কাছেই যাচ্ছে। কি বলো মা আলো? কমল উপস্থিত থাকিলে মুখ তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিত। পুরুষেরা না থাকিলে সে সহজেই সায় দিয়া সলজ্জকণ্ঠে কহিত—বাবা ত সত্যিই জানেন, আপনি আমার মায়ের মত।

এই একটা বছর এমনিভাবেই কাটিয়া গিয়াছিল।

টেনিস টুর্নামেন্টের অদ্যকার পালা সমাপ্ত হইলে ইন্দুদের বাটীতে চা ও সামান্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। সে-সকল শেষ হইতে সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু সেদিকে আলেখ্যের আজ খেয়ালই ছিল না। সে ভাল খেলিত, কানপুর হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হারিয়া গিয়াছিলেন, সেই জয়ের আনন্দে মন তাহার আজ অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। তথাপি ইন্দুর গান শেষ না হইতেই তাহাকে ঘড়ির দিকে চাহিয়া অলক্ষ্যে উঠিয়া পড়িতে হইল এবং সঙ্গীহীন পিতার

কথা স্মরণ করিয়া বিদায়গ্রহণের প্রচলিত আচরণটুকু পরিহার করিয়াই তাহাকে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিতে হইল। মোটর তাহার প্রস্তুত ছিল, শোফার দ্বার খুলিয়া দিতেই গাড়িতে উঠিয়া পরিশ্রান্ত দেহলতা সে এলাইয়া দিয়া বসিল। রাত্রি অন্ধকার নহে, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, অদূরে একটা বিলাতী লতার কুঞ্জ হইতে একপ্রকার উগ্র গন্ধে নিঃশ্বাসের বাতাস যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। অত্যধিক খেলার পরিশ্রমে সে ক্লান্ত, কিন্তু যৌবনের উষ্ণ রক্ত তখনও খরবেগে শিরার মধ্যে বহিতেছে—এমন না বলিয়া চুপি চুপি আসাটা ভাল হইল না, সে ভাবিতেছে, এমন সময়ে ঠিক কানের কাছে শুনিল, হঠাৎ পালিয়ে এলে যে গালো?

আলেখ্য চকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল,—এঁরা কিছু বলছেন বুঝি?

কমল হাসিয়া কহিল—না। তার কারণ, আমি ছাড়া কেউ জানতেই পারেননি। কিন্তু আমাব চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। জ্যোৎস্নার আলোকে আলেখ্যের মুখের চেহারা দেখা গেল না। সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল—আপনি ত জানেন, বাবা একলা আছেন. একটু রাত হলেই তিনি বড় ব্যস্ত হন।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—জানি এবং সেই রাত করা তোমার উচিতই নয়।

শোফার গাড়িকে প্রস্তুত করিযা উঠিয়া বসিতেই কমল চুপি চুপি বলিল—হুকুম দাও ত তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসি।

আলেখ্য মনে মনে লজ্জা বোধ করিল, কিন্তু না বলিতে পারিল না। শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ফিরবেন কি করে?

কমল কহিল—চমৎকার রাত, দিব্যি বেড়াতে বেড়াতে ফিরে আসবো। তখন পর্যন্ত হয়ত এঁরা কেউ টেরও পাবেন না। এই বলিয়া সে নিজেই দরজা খুলিয়া আলেখ্যের পাশে আসিয়া উপবেশন করিল।

বেশী দূর নয়, মিনিট পাঁচ-ছয় মাত্র। অতি প্রয়োজনীয় কথার জন্য ইহাই পর্যাপ্ত। কিন্তু কোন কথাই হইল না, পাশাপাশি উভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া। গাড়ি রে-সাহেবের ফটকে আসিয়া প্রবেশ করিল। আলেখ্যের অত্যন্ত লজ্জা করিতেছিল, মোটরের শব্দে বাবা নিশ্চয়ই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবেন, কিন্তু উপরেব বারান্দা শূন্য, কোথাও কেহ নাই। দুজনে অবতরণ করিলে শোফার গাড়ি লইয়া প্রস্থান করিল। কমল মৃদুকণ্ঠে বিদায় লইয়া ফিরিল, হলে ঢুকিয়া আলেখ্য বেহারাকে সভয়ে প্রশ্ন করিল—সাহেব কোথায়?

সে সেলাম করিয়া জানাইল, তিনি উপরের ঘরেই আছেন।

আলেখ্য দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া তাহার পিতার ঘরে ঢুকিযা একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। আলমারি খোলা, ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো, সাহেব নিজে আর একটা বেহারাকে দিয়া বড় বড় দুটো তোরঙ্গ ভর্তি করিতেছেন।

এ কি বাবা, কোথাও যাবে নাকি?

সাহেব চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—দেখ দিকি সব কাণ্ড! তখন

বলেছি, গান্ধী সর্বনাশ করবে! এই সব স্বদেশী গুন্ডারা দেশটাকে লন্ডভন্ড করে তবে ছাড়বে, এ যে আমি শুরুতেই দেখতে পেয়েছি! এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটা চিঠি লইয়া মেয়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, এদের সবাইকে ধরে জেলে না পাঠালে যে সমস্ত দেশ অরাজক হতে বাধ্য।

মাত্র ঘন্টা তিন-চার পূর্বেই যে তিনি প্রায় উল্টা কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া কোন লাভ নাই। আলেখ্য নিঃশব্দে চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া আলোর সম্মুখে গিয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পড়িয়া ফেলিল। চিঠি তাঁহার ম্যানেজারের। তিনি দুঃখ করিয়া, বরঞ্চ কতকটা ক্রোধের সহিতই জানাইতেছেন যে, জমিদারির অবস্থা অতিশয় বিশৃঙ্খল। তিনি উপর্যুপরি কয়েকখানা পত্রে সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদন করিয়াও প্রতিবিধানের কোন আদেশ পান নাই। অপিচ, প্রকারান্তরে তাহাদের প্রশ্রয় দেওয়াই হইয়াছে। দুর্বৃত্তরা ক্রমশঃ এরূপ স্পর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহাকেই অপমান করিয়াছে। এমন কি, তিনি লোকজন লইয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অমরপুরের হাটে বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহাতে জমিদারির আয় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। অবশেষে নিরুপায় হইয়াই তিনি সকল ঘটনা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গোচর করায় ইহাদের প্ররোচনায় বিদ্রোহী প্রজারা ধর্মঘট করিয়া খাজনা আদায় বন্ধ করিয়াছে। এমন কি, লুটপাটের ভয়ও দেখাইতেছে। সরকারী খাজনা জমা দিবার সময় হইয়া আসিল, কিন্তু তহবিলে কিছুমাত্র টাকা মজুদ নাই। ইহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। জনরব এইরূপ যে মালিক নিজে না আসিলে কোন উপায় হইবে না।

চিঠি পড়িয়া আলেখ্যর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—বাবা, তুমি নিজে যাচ্ছো?

বাবা বলিলেন—নিজে না গেলে কি হয় মা? যাবো আর আসবো!—একটা দিনে সমস্ত শায়েস্তা হয়ে যাবে। ঘোষ-সাহেবকে বলে যাবো, তিনি দুবেলা এসে দেখবেন, তোমার কোন কষ্ট হবে না।

মেয়ে সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল ম্যানেজারবাবু তোমাকে বারবার সতর্ক করেছেন, তবু তুমি কিছুই করোনি বাবা?

সাহেব সতেজে বলিলেন—করেছি বৈ কি, নিশ্চয় করেছি। বোধ হয় চিঠির জবাবও দিয়েছি।

মেয়ে ক্ষণকাল বাপের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—বোধ হয় দাওনি বাবা, তুমি ভুলে গেছ।

সাহেবের গলার সুর সহসা নীচের পর্দায় নামিয়া আসিল,—কহিলেন—ভুলে যাবো কেন? এই যে সেদিন নিজের হাতে লিখে দিলাম, লোকেরা বিলিতী কাপড় যদি পরতে না চায় ত হাটে এনে কাজ নেই। তাতে লোকসান ছাড়া ত লাভ নেই কারো

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই আলেখ্য ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—এ চিঠি আবার তুমি কাকে লিখলে বাবা? কৈ, ম্যানেজারবাবুর পত্রে ত এর কোন কথা নেই।

সাহেব চিন্তিত মুখে বলিলেন—ঐ যে সব কারা কলকাতা থেকে এসে গ্রামে গ্রামে নাইট ইস্কুল খুলেছে। চাষাভুষোদের সব মত জেনে আধার হুকুম চেয়েছিল,—তা বেশ ত, তারা যা ইচ্ছে করুক না, আমার কি? আমার খাজনা পেলেই হ'ল।

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল—তা হলে আমাদের গ্রামেও নাইট ইস্কুল খোলা হয়েছে?

বাবা সগর্বে বললেন—নিশ্চয় হয়েছে। নিশ্চয় হয়েছে। আমিই ত বলে দিলাম, মন্দিরের নাটবাংলাটা পড়ে আছে, ইচ্ছে হয় তাতেই করুক। সামান্য একটু তেলের খরচা বৈ ত না।

মেয়ে কহিল—তেলের খরচও বোধ হয় কাছারি থেকেই দেওয়া হচ্ছে?

বাবা বলিলেন—হুকুম ত দিয়েছি, এখন না যদি করে, দূর থেকে আর কত দেখি বল?

মেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল—বাবা, তুমি ও-ঘরে গিয়ে ব'সগে, আমি নিজে সব গুছিয়ে নিচ্চি। তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।

পিতা সবিস্ময়ে কহিলেন—তুমি যাবে?

আলেখ্য বলিল—হাঁ বাবা—আমার বোধ হয়, আমি না গেলে চলবে না।

দুই

পিতার সঙ্গে আলেখ্য জীবনে এই প্রথম তাহার স্বর্গীয় পিতামহগণের পল্লীবাস-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স তাহার বেশী নয়, তথাপি এই বয়সেই সে তিনবার য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছে। দার্জিলিং ও সিমলার পাহাড় বোধ করি কোন বৎসরেই বাদ পড়ে নাই; চা ও ডিনারের অসংখ্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছে এবং মা বাঁচিয়া থাকিতে নিজেদের বাটীতেও তাহার ত্রুটিহীন বহু আয়োজনে যোগ দিয়াছে। গান-বাজনার মজলিস হইতে শুরু করিয়া খেলাধুলা ও সাধারণ সভা-সমিতিতে কিভাবে চলাফেরা করিতে হয়, সোসাইটিতে কেমন করিয়া কথাবার্তা কহিতে হয়, কোথায়, কবে এবং কোন সময়ে কি পোষাক পরিতে হয়, কোন রং কোন্ ফুল কখন কাহাকে মানায়, এ-সকল ব্যাপার সে নির্ভুলভাবে শিক্ষা করিয়াছে, রুচি ও ফ্যাশন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার বাকী কিছু আর তাহার নাই, শুধু কেবল এই খবরটাই সে এতকাল লয় নাই, এ-সকল কোথা হইতে এবং কেমন করিয়া আসে। মা ও মেয়ে এতদিন শুধু এতটুকু মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, বাংলাদেশের কোন এক পাড়াগাঁয়ে তাহাদের কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার মূলে জলসেক করিতে হয় না,

খবরদারি লইতে হয় না, শুধু তাহাতে সময়ে ও অসময়ে নাড়া দিলেই সোনা ও রূপা ঝরিয়া পড়ে। জননী ত কোনদিনই গ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু আলেখ্য কখন কখন যেন লক্ষ্য করিয়াছে, এই বিপুল অপব্যয়ের যোগান দিতে পিতা যেন মাঝে মাঝে কেমন একপ্রকার বিরস ম্লান ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। তাহাকে এমন আভাস দিতেও সে দেখিয়াছে বলিয়াই মনে পড়ে, যেন এতখানি বাড়াবাড়ি না হইলেই হয় ভাল। অথচ প্রত্যুত্তরে মায়ের মুখে কেবল এই কথাই সে শুনিয়া আসিয়াছে যে, সমাজে থাকিতে গেলে ইহা না করিলেই নয়। শুধু অসভ্যদের মত বনে-জঙ্গলে বাস করিলেই কোন খরচ করিতে হয় না।

পিতাকে প্রতিবাদ করিতে কখন দেখে নাই,—কিন্তু চুপ করিয়া এমন নির্জীবের মত বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে যে, ধুমধামের মাঝখানে গৃহকর্তার সে আচরণ একেবারেই বিসদৃশ। কিন্তু সে ত ক্ষণিকের ব্যাপার, ক্ষণকাল পরে সে ভাব হয়ত আর তাঁহাতে থাকিত না। বিশেষতঃ তখনও কত আয়োজন, কত কাজ বাকী,—নিমন্ত্রিতগণের বাড়ি ও মোটর আসিবার মুহূর্ত আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে—সে লইয়া মাথাব্যথা করিবার সময় ছিলই বা কৈ? এমনি করিয়াই এই মেয়েটির ছেলেবেলা হইতেই এতকাল কাটিয়াছে এবং ভবিষ্যতের দিনগুলাও এমনিভাবেই কাটিবার মত করিয়াই মা তাহার শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

দিন-চারেক হইল, তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন। জমিদারের বাড়ি, বড়লোকের বাড়ি,—বড়লোকের জন্যই নূতন করিয়া নির্মিত হইয়াছিল, কোথাও কোন ত্রুটি নাই, তথাপি কত অভাব, কত অসুবিধাই না আলেখ্যের চোখে পড়িতেছে। বসিবার ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘরগুলোর আগাগোড়া পেন্টিং নূতন করিয়া না করাইলে ত একটা দিনও আর বাস করা চলে না। দরজা-জানালার কদর্য রং বদল না করিলেই নয়। আসবাবগুলা মান্ধাতার কালের, না আছে ছন্দ, না আছে তাহার শ্রী ধুলোয় ধুলোয় বার্নিশ ত না থাকার মধ্যেই, সুতরাং এ বাটীতে থাকিতে হইলে এ সকলের প্রতি চোখ বুজিয়া থাকা অসম্ভব! যেমন করিয়া হউক, চার-পাঁচ হাজার টাকার কমে হইবে না। এই প্রস্তাব লইয়া সেদিন সকালে আলেখ্য তাহার পিতার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবা একজন অল্পবয়সী অধ্যাপক ব্রাহ্মণের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, মেয়ের সহিত তাঁর পরিচয় করিয়া দিতে কহিলেন,—ইনি আমাদের পুরোহিত বংশের দৌহিত্র, অমরনাথ ন্যায়রত্ন, আমাদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত বরাট গ্রামে এর পৈত্রিক টোলে অধ্যাপনা শুরু করেছেন,—ইনি আমার কন্যা আলেখ্য রায়,—মা, এঁকে প্রণাম কর।

আদেশ শুনিয়া আলেখ্যের গা জ্বলিয়া গেল। একে ত একান্ত গুরুজন ব্যতীত ভূমিষ্ঠ প্রণাম করার রীতি তাহাদের সমাজে নাই বলিলেই হয়, তাহাতে আবার এই অপরিচিত লোকটি পুরোহিত-বংশের। এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সে শিশুকাল হইতে সংখ্যাতীত অভিযোগ শুনিয়া আসিয়াছে; ইহাদের অন্ধতা ও অজ্ঞতা ও

নিরতিশয় সঙ্কীর্ণতাই যে দেশের সকল অনিষ্টের মূল; ইহাদের প্রতিকূলতার জন্যই যে তাহারা হিন্দু-সমাজে স্থান পায় না, সেই বিশ্বাসই তাহার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া আছে, এখন তাহাদেরই একজন অজানা ব্যক্তির পদতলে কিছুতেই তাহার মাথা হেঁট হইতে চাহিল না। সে হাত তুলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া কোনমতে তাহার পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিল। কিন্তু এতটুকু তাহার চক্ষু এড়াইল না যে, সে ব্যক্তি নমস্কার তাহার ফিরাইয়া দিল না, শুধু নীরবে একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। আলেখ্য পলকমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। সে পিতার সঙ্গেই কথা কহিতে আসিয়াছিল—সুতরাং যে অপরিচিত, তাহাকে অপরিচিতের মতই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গেই কথা কহিতে নিরত হইল তথাপি সকল সময়েই সে যেন অনুভব করিতে লাগিল, এই অপরিচিত অধ্যাপকের অভদ্র বিস্মিত দৃষ্টি তাহাকে পিছন হইতে যেন নিঃশব্দে আঘাত করিতেছে।

আলেখ্য কহিল—বাবা, ঘরগুলো সব কি হয়ে আছে, তুমি দেখেছ?

পিতা কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন,—কেন মা, বেশ ভালই ত আছে।

কন্যা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিল। কহিল ওকে তুমি ভাল বল বাবা? বিশেষ করে বসবার আর খাবার ঘর দুটো? আমার ত মনে হয়, তাড়াতাড়ি একবার পেন্ট করিয়ে না দিলে ওতে না-বসা না-খাওয়া কোনটাই চলবে না। আচ্ছা, লোকগুলো তোমার এতদিন করছিল কি? আমার মতে এদের সব জবাব দেওয়া দরকার। পুরানো লোক দিয়ে হয় না,—তারা শুধু ফাঁকিই দেয়।

পিতা মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন, কিন্তু আস্তে আস্তে বলিলেন—সে ঠিক কথাই বটে, কিন্তু হলোও ত অনেকদিন মা. বাস না করলেও ঘরদোরের শ্রী থাকে না।

আলেখ্য কহিল সে শ্রী অন্যরকমের, নইলে এ কেবল তাদের অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হয়েছে। আমি ম্যানেজার থেকে চাকর মালী পর্যন্ত সকলের কৈফিয়ত নেবো। দোষ পেলেই শাস্তি দেবো, বাবা, তুমি কিন্তু তাতে বাধা দিতে পারবে না।

পিতা হাসিয়া কহিলেন—বাধা দিতে যাব কেন মা, সমস্তই ত তোমার। তোমার ভৃত্যদের তুমি শাসন করবে, আমি কেন নিষেধ করব? বেশ জানি, অন্যায় তুমি কারও 'পরেই করবে না।

কন্যা মনে মনে খুশী হইল। কহিল—ফার্নিচারগুলোর দশা এমন হয়েছে যে, সেগুলো ফেলে দিলেই হয়। চার-পাঁচ হাজার টাকার কমে বোধ করি কিছুই করতে পারা যাবে না।

—এত টাকা? বৃদ্ধ শঙ্কিত হইয়া কহিলেন—কিন্তু এ জঙ্গলে তুমি ত থাকতে পারবে না আলো, দু'দিনের জন্যে খরচ করে সমস্তই আবার এমনি ধারা নষ্ট হয়ে যাবে।

আলেখ্য মাথা নাড়িল। কহিল—আমি স্থির করেছি বাবা, এবার আমরা থাকবো। যদি যেতেও হয়, বছরে অন্ততঃ দু'বার করে আমরা বাড়িতে আসবই।

চোখ না রাখলে সমস্তই নষ্ট হয়ে যাবে, এ আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি।

পিতা প্রফুল্লমুখে বারবার মাথা নাড়িয়া বলিলেন এতকাল পরে এ কথা যদি বুঝে থাক আলো, তার চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে?—এই বলিয়া অধ্যাপকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন - কি বল অমরনাথ, এতদিনে মেয়ে যদি এ কথা বুঝে থাকেন তার চেয়ে আনন্দের কথা কি আছে?

অধ্যাপক হাঁ না কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু কন্যা হাসিয়া কহিল - আমার বুঝতে ত খুব বেশীদিন লাগেনি বাবা, লাগলো তোমার। বছর দশ-পনর আগেও যদি বুঝতে, আজ আমাকে আবার সমস্ত নূতন করে করতে হ'ত না।

কন্যার ইচ্ছাকে বাধা দিবার শক্তি বৃদ্ধের ছিল না। কিন্তু তাঁর মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কহিলেন—যদি করতেও হয়, তাব তাড়াতাড়ি কি? ধীরেসুস্থে করলেও ত চলবে।

মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া বলিল - না বাবা, সে হয় না। এই বলিয়া সে তাহার হাতের একখানা ইংরাজী উপন্যাসের পাতার ভিতর হইতে খুঁজিয়া একখানা টেলিগ্রাম পিতার হাতে তুলিয়া দিল। তিনি পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া কাগজখানি আদ্যোপান্ত বার দুই-তিন পাঠ করিয়া, কন্যাকে ফিরাইয়া দিয়া ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন তাই ত! কমলাকিরণ তাঁর মা ও ভগিনীকে নিয়ে কলকাতায় আসছেন, সম্ভবতঃ ঘোষ-সাহেবও আসতে পারেন। কি নাগাত তাঁরা এ বাড়িতে আসবেন, কিছু জানিয়েছেন।

মেয়ে কহিল - কলকাতায় এসে বোধ হয় জানাবেন।

রে-সাহেব চশমা খুলিয়া খাপে পুরিয়া পকেটে রাখিলেন, সমস্ত মাথাজোড়া টাকের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে শুধু বলিলেন—তাই ত—

তাহার অকালবৃদ্ধ পিতার অসচ্ছলতার পরিমাণ ঠিক না জানিলেও আলেখ্য কিছুদিন হইতে তাহা সন্দেহ করিতেছিল; এবং হয়ত, এখনই এ লইয়া আলোচনাও করিত না, কিন্তু তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন - কত টাকা তোমার অবশ্যক বলে মনে হয়, আলো? নিতান্তই যা না হলে নয়, এমনি -

আলেখ্য মনে মনে হিসাব করিয়া কহিল—দাম ঠিক বলতে পারব না বাবা, কিন্তু গোটা-চারেক শোবার ঘর অন্ততঃ চাই-ই। গোটা-চারেক ড্রেসিং টেবলু, গোটা-দশেক ইজিচেয়ার—

সাহেব সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—গোটা-দশেক! একটুখানি থামিয়া অধ্যাপকের প্রতি মুখ তুলিয়া কহিলেন, অমরনাথ, তোমার বিদেশী ছাত্রদের সম্বন্ধে - দেখ, আমি বিশেষ দুঃখিত হয়ে জানাচ্ছি, সাহায্য যে কিছু করে উঠতে পারবো, তা আমার মনে হয় না।

অধ্যাপক শুধু একটু মুচকি হাসিয়া কহিলেন—সে আমারও মনে হয় না, স্যার-মশায়।

ক্রোধে আলেখ্যের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তাহাদের পারিবারিক আলোচনার সূত্রপাতেই যে অপরিচিত অভদ্র লোকটার সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল, সে শুধু কেবল বসিয়াই রহিল তাহা নয়, প্রকারান্তরে তাহাতে যোগ দিল, সে ও আবার বিদ্রূপের ভঙ্গীতে। বিশেষ করিয়া পিতার প্রতি তাহার সম্বোধনের ভাষাটা মেয়ের কানে যেন সূঁচ বিঁধিল। ইহা সত্বেও কিন্তু আলেখ্যের চিরদিনের শিক্ষা তাহাকে অসংযত হইতে দিল না, সে বাহিরের এই ভিক্ষুকটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—না হলে হবে কেন বাবা? তা ছাড়া খাটের গদিগুলো সব মেরামত করানো চাই, ঘরে কার্পেট নেই, তাও কিনতে হবে, চা এবং ডিনার সেট সব আনিয়ে নিতে হবে, হয়ত তিন-চার হাজারেও কুলোবে না, আরও বেশী টাকার দরকার হয়ে পড়বে।

বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন —সেইরকমই মনে হচ্ছে বটে।

এত বড় নিশ্বাসের পরে মেয়ের পক্ষে হাসা কঠিন, তবুও সে জোর করিয়াই হাসিয়া বলিল—যে সমাজের যে-রকম রীতি। তাঁরা এলে তুমি ত আর রাইট রয়েল ইণ্ডিয়ান স্টাইলে ভাঁড় এবং কলাপাত দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে পারবে না, ইজিচেয়ারের বদলে কুশাসন পেতেও অতিথি-সৎকার চলবে না,—উপায় কি?

রে-সাহেব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন,- বেশ তাই হবে। বাস্তবিক না হলেই যখন নয়, তখন ভাবনা বৃথা। তা হলে তুমি একটা ফর্দ তৈয়ারী করে ফেল।

আলেখ্য ঘাড় নাড়িয়া কহিল—আমি সমস্ত ঠিক করে নেব বাবা, তুমি কিছু ভেবো না। একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার ভাবনার ত কিছুই ছিল না বাবা, শুধু যদি একটুখানি চোখ রাখতে।

পিতা কথা কহিলেন না। বোধ করি, মনে মনে এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন যে দুই চক্ষু ত এখন বিস্ফারিত হইয়াই খুলিয়াছে, কিন্তু দুশ্চিন্তার পরিমাণ তাহাতে কমিতেছে কৈ? মেয়ে কহিল—তোমাকে কিন্তু আমি আর সত্যিই কিছু করতে দেব না বাবা, যা-কিছু করবার, আমি করব। কত অপব্যয়ই না এই দীর্ঘকাল ধরে নির্বিঘ্নে চলে আসছে। কিসের জন্য এত লোকজন? চোখে দেখতে পায় না, এমন বোধ হয় বিশ-পঁচিশজন কাছারি জুড়ে বসে আছে। আমরণ তারা কি ফাঁকি দিয়েই কাটাবে? আমি সমস্ত বিদায় দিয়ে ইয়ং মেন বহাল করব। ঠিক অর্ধেক লোকে ডবল কাজ পাব। কতগুলো ঠাকুরবাড়িই রয়েছে বল ত? কত টাকাই না তাতে বৃথা ব্যয় হয়। একা ঘর থেকেই ত বোধ হয় আমি বছরে দশ-বারো হাজার টাকা বাঁচাতে পারবো।

বৃদ্ধ বোধ করি এতক্ষণ তাঁহার আগচ্ছমান সম্মানিত অতিথিবর্গের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন, এদিকে তেমন মন ছিল না, কিন্তু কন্যার শেষ কথাটা কানে যাইবামাত্র একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন—কার থেকে বাঁচাবে বলছ মা, দেবসেবা

থেকে? কিন্তু সে-সমস্ত যে কর্তাদের আমল থেকে চলে আসছে, তাতে হাত দেবে কি করে?

মেয়ে কহিল—কর্তারা নয় ত কি তোমাকে দোষ দিচ্ছি বাবা, তুমি নিজে কতগুলো পুতুলপুজো বসিয়েছ? অপব্যয়ের সূত্রপাত তাঁরাই করে গেছেন জানি, কিন্তু অন্যায় বা ভুল যাঁরাই কেন না করে থাকুন, তার সংশোধন করা ত প্রয়োজন? তোমার ত মনে আছে বাবা, মা তোমাকে কতদিন এই-যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে বলেছেন।

পিতা চুপ করিয়া শুধু একদৃষ্টে কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেই বিস্ময়ক্ষুব্ধ চোখের সম্মুখে আলেখ্য কেবলমাত্র যেন নিজের লজ্জা বাঁচাইবার জন্যই সহসা বলিয়া উঠিল— বাবা, তুমি কি এই-সব পুতুলপুজো বিশ্বাস কর?

পিতা কহিলেন, আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপর ত এঁদের প্রতিষ্ঠা হয়নি মা!

কন্যা কহিল—তবে তুমি কেন এর ব্যয় বহন করবে, বাবা?

পিতা বলিলেন—আমি ত করিনে, আলো। যাঁরা মাথায় করে এনে স্থাপিত করেছিলেন, আমার সেই পিতৃপিতামহেরাই এখনো তাঁদের ভার বয়ে বেড়াচ্ছেন। যে-সব পুতুল-দেবতাদের তুমি বিশ্বাস করতে পার না মা, তাঁদেরও বঞ্চিত করতে তোমাকে আমি দিতে পারব না।

প্রত্যুত্তরে আলেখ্য পিতার এই হীন দুর্বলতার একটা তীক্ষ্ণ জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু একান্ত বিস্ময়ে সে কথা ভুলিয়া গেল। যে অধ্যাপকটি এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ছিল, অকস্মাৎ সে হেঁট হইয়া হাত দিয়া সাহেবের বুটের তলা হইতে ধুলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপার কি হে, অমরনাথ? তুমি আবার এ কি করলে?

অমর সবিনয়ে কহিল – কিছুই না রায়-মশায়, এসে আপনাকে প্রণাম করা হয়নি, শুধু সেই ত্রুটিটা এখন সেরে নিলাম।

সাহেব বলিলেন – ত্রুটি কিসের হে, আমার মত লোককে তুমি প্রণাম করতে যাবে কিসের জন্যে? আমি ত ব্রাহ্মণই নয় বললে হয়।

অমর কহিল—সে আপনি জানেন, আমি আমার কর্তব্য পালন করলাম মাত্র। অজ্ঞাতে কত ভুল, কত অন্যায়ই না মানুষের হয়।

বুড়া বোধ হয় বুঝিলেন না, বলিলেন—সে ত সর্বদাই হচ্ছে অমরনাথ, মানুষের ভুল ভ্রান্তির কি আর সীমা আছে? কিন্তু আমাকে প্রণাম না করাটা তোমার ভুলের মধ্যে নয়, - আমি আর ওর যোগ্যই নয়।

অমরনাথ এ কথার প্রতিবাদ করিল না—কোন জবাবই দিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না আলেখ্য। গায়ে পড়িয়া কথা কহা তাহার শিক্ষাও নয়, স্বভাবও নয়, কিন্তু তাহার বিস্ময়ের মাত্রা ক্রোধে পর্যবসিত হইয়া প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কহিল—বাবা, এখন কিন্তু তোমার ওঁর

বিদেশী ছাত্রদের সাহায্য না করলেই নয়।

ভালমানুষ বুড়া বিদ্রূপের ধার দিয়াও গেলেন না, আন্তরিক সঙ্কোচের সহিত কহিলেন—সাহায্য করাই ত কর্তব্য মা, কিন্তু তুমি কি মনে কর, এ সময়ে আমরা বিশেষ কিছু করে উঠতে পারবো ?

মেয়ে কহিল সাহায্য যদি কর বাবা, একটু লুকিয়ে ক'রো। তোমার দেব-দ্বিজে ভক্তির কথা রাষ্ট্র হয়ে গেলে বিপদ হবে।

পিতা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন বিপদ হবে ?

অধ্যাপক হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—বিপদ হবে না,—আপনি কোন ভয় করবেন না। ড্রেসিং টেবিল আর কাঁটা-চামচে-ডিসের নীচে সমস্ত চাপা পড়ে যাবে।

আঘাত করিতে পাইয়া আলেখ্যের মনের তিক্ততা এই অপরিচিত লোকটির বিরুদ্ধে কতকটা ফিকা হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ অপরের তীক্ষ্ণ পরিহাসের প্রতিঘাতে হঠাৎ সে যেন একেবারে ক্রুর হইয়া উঠিল। আলেখ্য সব ভুলিয়া প্রত্যুত্তরে কহিল, চাপা পড়তে পারে বটে, কিন্তু বুটের ধুলোর দামটাও ত আপনাকে দিতে হবে !—কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজেই যেন লজ্জায় একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এতবড় নিষ্ঠুর কদর্য কথা যে কি করিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, সে ভাবিয়াই পাইল না। রে-সাহেব অত্যন্ত বিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি যত সাদাসিধাই হউন, এ কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন। বেহারা আসিয়া স্মরণ করাইয়া দিল যে, ভদ্রলোকগুলি বাহিরের ঘরে বহুক্ষণ অবধি অপেক্ষা করিতেছেন।

বল গে যাচ্ছি, বলিযা সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শান্তকণ্ঠে কহিলেন,—কথাটা তোমার ভাল হয়নি আলো। অমরনাথ, তুমি একটু বসো, আমি এখনি আসছি।—এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। আলেখ্য তাঁহার পিছনে পিছনেই ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। পিতা দৃষ্টির অন্তরালে যাইতেই নিরতিশয় লজ্জার সহিত আস্তে আস্তে কহিল—আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই. কিন্তু নিজের ব্যবহারের জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। আমি স্বীকার করছি, আপনাকে ও-কথা বলা আমার ভাল হয়নি।

অধ্যাপক কহিলেন, না ভাল হয়নি।

এই সোজা কথাটাও আলেখ্যের কিন্তু ভাল লাগিল না। সে এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, পিতাকে মর্যাদা দেখালে কন্যার খুশী হবারই কথা। আমার বাবা অত্যন্ত ভালমানুষ, তাঁর সঙ্গে ছলনা করাও আপনার উচিত হয়নি।

অধ্যাপক কহিলেন—ছলনা ত করিনি !

আলেখ্য প্রশ্ন করিল—আড়ম্বর করে হঠাৎ পায়ের ধুলো নেওয়াই কি সত্য ?

অধ্যাপক কহিলেন—সত্য বৈ কি।

আলেখ্য বলিল—তা হলে আমার আর কিছুই বলবার নেই। আমি ভুল বুঝেছিলাম।—এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। আপনার পুরোহিতের ব্যবসা, সুতরাং বাবার দুর্বলতায় আপনার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক, কিন্তু যাঁর ধর্মবিশ্বাস অন্য প্রকারের, ঠাকুর-দেবতা যিনি কোনদিন মানেন না, তাঁর পক্ষে এই অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া কি আপনিই অন্যায় মনে করেন না?

অধ্যাপক মাথা নাড়িয়া কহিলেন—না, করিনে। অন্যায় কেবল সেইখানেই হ'ত স্নেহের দুর্বলতায় যদি তিনি আপনাকে প্রশ্রয় দিতেন—তাঁর নিজের অবিশ্বাস যদি তাঁর কর্তব্যকে ডিঙিয়ে যেতো।

অধ্যাপকের জবাবের মধ্যে খোঁচা ছিল। আলেখ্যর দুই ভ্রু কুঞ্চিত হইল। কহিল—আপনার বক্তব্য এই যে, নিজের বিশ্বাস যার যেমনই হউক, যা চলে আসছে তাকে চলতে দেওয়াই কর্তব্য।

অধ্যাপক হাসিলেন, বলিলেন—আপনার ওটা বিলাতী ঢঙের অত্যন্ত মামুলি যুক্তি। নিজের বিশ্বাসের দেবী একটা আছেই, কিন্তু তার পরের কথা আপনি যখন জানেন না, তখন এ তর্কে শুধু তিক্ততাই বাড়বে, আর কোন ফল হবে না। কিন্তু সে যাক, ঠাকুরবাড়ির পুতুল দেবতারা সত্যিই হোন, মিথ্যাই হোন, কথা যে কন না, এ কথা খুবই সত্য। তাঁদের অনাহারে রাখলেও তাঁরা আপত্তি করবেন না। কিন্তু এত টাকার বিলাতী আয়না এবং বিলাতী মাটির বাসন কিনলে যারা আপত্তি করবে, তারা কথাও কবে। হয়ত, খুব উঁচু গলাতেই কথা কবে। এ কাজ করবার চেষ্টা আপনি করবেন না।

এইবার তাহার সমস্ত কথার মধ্যেই এমন একটা তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত ছিল যে, আলেখ্য নিজেকে শুধু অপমানিত নয়, লাঞ্ছিত জ্ঞান করিল। এতক্ষণ পরে সে যথার্থই ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বারবার এই লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার পরিধানের হাতের মোটা কাপড়, মোটা উত্তরীয় এবং খালি পা লক্ষ্য করিয়া অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—আপনি বোধ হয় একজন নন-কো-অপারেটর, না?

অধ্যাপক কহিলেন—হাঁ।

এখানে বটুকদেব কার নাম জানেন?

জানি। আমারই ডাক-নাম।

আলেখ্য কহিল—তাই বটে! তা হলে সমস্তই বুঝেচি। কিন্তু জিনিস কেনা আমার কি করে বন্ধ করবেন? আমার প্রজাদের বোধ করি খাজনা দিতে নিষেধ করে দেবেন?

অধ্যাপক কহিলেন—অসম্ভব নয়। প্রজাদের অনেক দুঃখের টাকা।

আলেখ্য কহিল—কিন্তু তাতেও যদি বন্ধ না হয়, বোধ হয় ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা

করবেন ?

অধ্যাপক কহিলেন—ভাঙবো কেন, আপনাকে কিনতেই ত দেব না।

আলেখ্য ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া প্রবল চেষ্টায় ভিতরের দুঃসহ ক্রোধ দমন করিল। শান্তকণ্ঠে কহিল,—দেখুন, অমরনাথবাবু, এ বিষয়ে আমার শেষ কথাটা আপনি শুনে রাখুন। বাবা নিরীহ মানুষ, কিন্তু আমি নিরীহ নই। তা হলে আমার আসার প্রয়োজন হ'ত না। আপনাদের নন্-কো-অপারেশন ভাল কি মন্দ, আমি জানিনে,—ভালও হতে পারে। কিন্তু আমার প্রজা, আমার আয়-ব্যয়, আমার সাংসারিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার ধাক্কা বাধিয়ে দেবেন না। পুলিশকে আমি ভালবাসি নে, তাদের দিয়ে দেশের লোককে শাস্তি দিতে আমার কষ্ট হয়, কিন্তু আমার হাত-পা বেঁধে দিয়ে আমাকে নিরুপায় করে তুলবেন না।—এই বলিয়া সে উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছিল, অমরনাথ ডাকিয়া কহিলেন—কিন্তু এমন যদি হয়, আপনি অন্যায় করছেন ?

আলেখ্য দ্বারের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনার সঙ্গে ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা আমার এক না-ও হতে পারে।—এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। যে রহিল, সে শুধু অবাক হইয়া সেই মুক্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।
('মাসিক বসুমতী', অগ্রহায়ণ ১৩৩০)

তিন

বিষয়-সম্পত্তির কাজে কন্যার উৎসাহ ও মনোযোগ দেখিয়া রে-সাহেব অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ঝাড়া-মোছা হইতে আরম্ভ করিয়া চুন দেওয়া, রং দেওয়া, আসবাবপত্রের পরিবর্তন, পরিবর্জন ইত্যাদিতে সমস্ত বাড়িটারও একদিকে যেমন সংস্কার শুরু হইল, অন্যদিকে শৃঙ্খলাহীন, ঢিলাঢালা জমিদারী সেরেস্তাতেও তেমনিই অত্যন্ত কড়া নিয়ম-কানুনসকল প্রত্যহই জারি হইয়া উঠিতে লাগিল। সাংসারিক সকল ব্যাপারেই অনভিজ্ঞ এই মেয়েটির মধ্যে যে এতখানি কর্মপটুতা ছিল, তাহা পেনশনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ম্যানেজারবাবু পর্যন্ত স্বীকার না করিয়া পারিলেন না। তাঁহার ত সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবসর নাই। দাখিলা, চিঠা, কবজ, খতিয়ান, রোকড়, রোডসেস্ কাহাকে কি বলে এবং কোথায় কি হয়, জমিদারী কাজের এইসকল পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা লইয়া আলেখ্যের কাছে তিনি ত প্রায় গলদঘর্ম হইয়া উঠিলেন। কর্মচারীদের মধ্যে কাহার কি কাজ, কত বেতন, ফাঁকি না দিলে কতখানি কাজ করা যায়, এ-সকল বুঝিয়া লইতে আলেখ্যের বিলম্ব হইল না। কয়েকটি স্থবির-গোছের লোকের প্রতি প্রথম হইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল, জেরার চোটে ম্যানেজার স্বীকার করিয়া ফেলিলেন যে, এইসকল লোকের দ্বারা বস্তুতঃ কোন উপকারই হয় না, এবং এ কথা তিনি ইতঃপূর্বে সাহেবকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ইনি এই বলিয়া জবাব

জাগঃ—২

দিয়াছিলেন যে, এই সংসারে চাকরি করিয়া আজ যাহারা বুড়া হইয়াছে, তাহাদের প্রতি জুলুম করিয়া কাজ আদায় করিবার আবশ্যকতা নাই, নূতন লোক বহাল করিলেই জমিদারির কাজ চলিয়া যাইবে। এইজন্যই এত লোক বেশী হইয়া পড়িয়াছে।

আলেখ্য কহিল—এবং এইজন্যেই বাবার খরচে কুলোয় না।

ম্যানেজার ব্রজবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

আলেখ্য কহিল—আমি কাজ চাই, দানছত্র খুলতে চাইনে।

ব্রজবাবু সবিনয়ে কহিলেন, আপনি যেমন আদেশ করবেন তেমনি হবে।

রে-সাহেব দিন দুই-তিন হইল কলিকাতায় তাঁহার পুরাতন বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না, এই অবকাশে আলেখ্য একদিন ম্যানেজারকে ডাকাইয়া তাঁহার হাতে একখানি ছোট কাগজ দিয়া কহিল—এদের আপনি এই মাসের মাইনেটা চুকিয়ে দিয়ে জবাব দিয়ে দেবেন। বাবা অত্যন্ত দুর্বলপ্রকৃতির মানুষ, তাঁকে জানাবার প্রয়োজন নেই।

ব্রজবাবু কম্পিতহস্তে কাগজখানি গ্রহণ করিলেন; চশমার ভিতর দিয়া নামগুলি একে একে পাঠ করিয়া তাঁহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া উঠিল। একটু সামলাইয়া কহিলেন—যে আজ্ঞে। কিন্তু এই নয়ন গাঙ্গুলী লোকটি বড় গরীব, তাঁর—

আলেখ্য কহিল—গরীবের জন্য সংসারে অন্য ব্যবস্থা আছে।

ব্রজবাবু বলিতে গেলেন, তা বটে, কিন্তু—

এ কিন্তুটা আলেখ্য শেষ করিতে দিল না, কহিল—দেখুন ম্যানেজারবাবু, এ নিয়ে আলোচনা স্বভাবতই অপ্রিয়। আমি বিশেষ চিন্তা করেই স্থির করেছি—আপনি এখন যেতে পারেন।

যে আজ্ঞা, বলিয়া বৃদ্ধ ব্রজবাবু কাগজখানি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। শিক্ষিতা জমিদার-কন্যার মেজাজের পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন, তাঁহার আর প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না—পাছে তাঁহার নিজের নামটাও বুড়া ও অকর্মণ্যদের তালিকাভুক্ত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ইহাও তিনি নিশ্চিত জানিতেন, যাহাদের কাজ গেল, তাহারা কেবল তাঁহার মুখের কথাতেই নিরস্ত হইবে না, আবেদন-নিবেদন সহি-সুপারিশ প্রভৃতি গোলামিগিরির যাহা কিছু দুনিয়ায় প্রচলিত আছে, সমস্তই চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

হইলও তাই। পরদিন চারখানা দরখাস্তই ব্রজবাবু আলেখ্যের ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। অধীনের নিবেদনে বাঙ্গালাদেশের সেই মামুলি দারিদ্র্যের ইতিহাসও তাহার হেতু। প্রত্যেকেই পরিবারস্থ বিধবাগণের সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে, এবং কান্নাকাটি করিয়া জানাইয়াছে যে, সে ভিন্ন তাঁহাদের দাঁড়াইবার আর কোথাও স্থান নাই। আলেখ্য কোনটাই গ্রাহ্য করিল না, এবং প্রত্যেক আবেদনপত্রের নীচেই ইংরাজী প্রথায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হুকুম দিল যে, এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ

নিরুপায়। ব্রজবাবু ঠিক ইহাই আশা করিয়াছিলেন, তিনি সকলকেই গোপনে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, সাহেব ফিরিয়া আসা পর্যন্ত যেন তাহারা ধৈর্য ধরিয়া থাকে। কারণ, চোখের জলের কোন দাম থাকে ত সে কেবল ওই স্বেচ্ছাচারী স্বল্পবুদ্ধি বুড়ার কাছেই আদায় হইতে পারে।

দিন-তিনেক পরে একদিন সকালে আলেখ্য তাহার বসিবার ঘরের বারান্দায় বসিয়া অনেকগুলা নকশার মধ্যে হইতে তাহাদের খাবার ঘরের পেণ্টিঙের ডিজাইনটা পছন্দ করিয়া বাহির করিতেছিল। একজন অতিশয় বৃদ্ধ-গোছের লোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটা যেমন রোগা, তেমনই তাহার পরনের কাপড়-চোপড় ময়লা এবং ছেঁড়া-খোঁড়া।

আলেখ্য মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে?

লোকটা সহসা জবাব দিতে পারিল না—তোতলা বলিয়া। তাহার পরে কহিল, আমি নয়ন গাঙ্গুলী।

আলেখ্য তাহাকে চিনিতে পারিয়া কঠোরভাবে বলিল—এখানে কেন?

সে কথা বলিবার চেষ্টায় আবার কিছুক্ষণ চোখ ও মুখের নানারূপ ভঙ্গী করিয়া শেষে কহিল—আমার মেয়ের নাম দুর্গা। সে বললে, বাবা তুমি তাঁর কাছে যাও, গেলেই চাকরি হবে। আমার একটি নাতি আছে, তার নাম গণপতি। তার ভারী বুদ্ধি।

ইহার চেহারা দেখিয়াই আলেখ্যের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, এই-সকল অসংলগ্ন কথা শুনিয়া বুঝিল, যাহাদের জবাব দেওয়া হইয়াছে, এই লোকটি তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে অপদার্থ। সে নকশার উপর হইতে চোখ না তুলিয়াই কহিল—আমার কাছে কিছু হবে না, আপনি বাইরে যান।

লোকটা তথাপি নড়িল না, সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহার সংসারের অবস্থা বর্ণনা করিতে লাগিল। বলিল যে, এই তের টাকা বেতন ভিন্ন তাহাদের আর কিছু নাই। ব্রাহ্মণী জীবিত নাই, বছর-পাঁচেক হইল ছেলেও মারা গিয়াছে, জামাই আসামে চাকরি করিতে গিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

আলেখ্য বিরক্ত হইয়া কহিল—আপনার ঘরের খবর শোনবার আমার ইচ্ছেও নেই, সময়ও নেই; আপনি এখান থেকে যান।

গাঙ্গুলী কর্ণপাতও করিল না, সে কত কি বলিয়া চলিতে লাগিল।

আলেখ্য নিরুপায় হইয়া তখন বেহারাকে ডাকিয়া এই লোকটাকে একপ্রকার জোর করিয়াই বিদায় করিয়া দিয়া পুনরায় নিজের কাজে মন দিল।

কলিকাতা হইতে কিছু কিছু আসবাব আসিয়া পেঁছিয়াছিল। পরদিন সকালে একটা মূল্যবান আয়না নিজের শোবার ঘরে খাটাইবার ব্যাপারে আলেখ্য নিজেই তত্ত্বাবধান করিতেছিল, হঠাৎ একটি বছর-দশেকের ছেলের হাত ধরিয়া ম্যানেজার

ব্রজবাবু প্রবেশ করিলেন। ছেলেটির পরনের বস্ত্র এত ছেঁড়া যে, নাই বলিলেই হয়। খালি পা, খালি গা, এত কাঁদিয়াছে যে, চোখ দুইটি রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। আলেখ্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিতে ব্রজবাবু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে আসতে হ'লো—

কাজের ব্যস্ততার মধ্যে ইহাদের আকস্মিক আগমনে আলেখ্য খুশী হইতে পারে নাই। ঘোষ-সাহেবদের আসার দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, অথচ বাটী সাজানো-গুছানোর কাজ এখনও বিস্তর বাকী ; কহিল—নিতান্ত জরুরী কাজ নাকি ?

ব্রজবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, নয়ন গাঙ্গুলীর কামাইয়ের দরুন পাঁচ টাকা মাইনে কাটা হয়েছিল, কিন্তু পরে বিবেচনা করবেন বলে একটা ভরসা দিয়েছিলেন—

আলেখ্য অপ্রসন্নমুখে বলিল—সে বিবেচনার আমি আর প্রয়োজন দেখিনে।

ব্রজবাবু প্রতিবাদ করিতে বোধ হয় সাহস করিলেন না, ছেলেটিকে লইযা নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, আলেখ্য কৌতূহলবশে সহসা জিজ্ঞাসা করিল—ছেলেটি কে ম্যানেজারবাবু, তাঁর নাতি বোধ করি ?

ছেলেটি নিজেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হাঁ, এবং বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রজবাবু তখন আস্তে আস্তে কহিলেন, চাকরি নেই শুনে মুদী কাল আব চাল ডাল কিছু দিলে না. হয়ত তার বাকীও ছিল সারাদিন খাওয়া দাওযা কাবও হ'ল না। ছেলে-জামাইয়ের শোকে বুড়ো বয়সে ইদানীং গাঙ্গুলী মশায়ের মাথাটাও তেমন ভাল ছিল না,—কি ভাবলে কি জানি, রাত্রেই কতকগুলো কলকে ফুলের বীচি বেটে খেয়ে আত্মহত্যা করে ফেলে—এখন আবার পুলিশ না এলে দাহ পর্যন্ত হওয়া

আলেখ্য চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—কে আত্মহত্যা করলে ?

ছেলেটি কাঁদিতেছিল, বলিল—দাদামশাই।

দাদামশাই ? নয়ন গাঙ্গুলী ? আত্মহত্যা করেছেন ?

ব্রজবাবু বলিলেন—হাঁ, ভোরবেলায় মারা গেছেন। টাকা পাঁচটা পেলে, এদের বড় উপকার হয়। ছেলেটিকে কহিলেন—মণি, হাতজোড় করে বল, মা, আমাদেব পাঁচ টাকা ভিক্ষে দিন। বল !

ছেলেটি কাঁদিতে কাঁদিতে হাতজোড় করিয়া তাঁহার কথাগুলো আবৃত্তি করিল। আর তাহার প্রতি অনিমেষ-চক্ষে চাহিয়া আলেখ্য মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মণিকে লইয়া ব্রজবাবু চলিয়া গেলেন। নয়ন গাঙ্গুলীর মৃতদেহের প্রায়শ্চিত্ত হইতে শুরু করিয়া সৎকার পর্যন্ত কিছুই টাকার অভাবে আর আটকাইয়া থাকিবে না, যাবার সময় তাহা তিনি বুঝিয়া গেলেন ; কিন্তু আলেখ্যের কাছে ঘরের পেণ্টিং হইতে সাজানো-গোছানো যা-কিছু কাজ সমস্তই একেবারে অর্থহীন হইয়া গেল। সেখান হইতে বাহির হইয়া সে তাহার বসিবার ঘরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

মিস্ত্রী আসিয়া আলমারি রাখিবার জায়গা দেখাইয়া দিতে কহিলে আলেখ্য বলিল—এখন থাক।

সরকার আসিয়া খাবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কহিল—যা হয় হোক, আমি জানিনে।

একটা মেরামতির কাজের হুকুম লইতে আসিয়া ঠিকাদার ধমক খাইয়া ফিরিয়া গেল। আলেখ্যের কেবলই মনে হইতে লাগিল, কিছুতেই আর তাহার প্রয়োজন নাই, এদেশে আর সে মুখ দেখাইতে পারিবে না। নবীন উদ্যমে বিলাতী প্রথায়, কড়া নিয়মে কাজ করিতে গিয়া আরম্ভেই সে যে এতবড় ধাক্কা খাইবে, তা কল্পনাও করে নাই। এ কি হইয়া গেল? বিদ্বেষবশে কাহারও প্রতি সে কোন অন্যায় করে নাই—হয়ত একটা ভুল হইয়াছে, কিন্তু এত বড় শাস্তি? একেবারে সে আত্মহত্যা করিয়া তাহার প্রতিশোধ দিল!

একজন ছোট-গোছের কর্মচারীকে গোপনে ডাকাইয়া আনিয়া সে একটি একটি করিয়া সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিল। নয়ন গাঙ্গুলী এই সংসারে চল্লিশ বৎসর একাদিক্রমে চাকরি করিয়াছে; বাস্তবিকই সে অত্যন্ত দরিদ্র, খান-দুই মাটির ঘর ছাড়া আর তাহার আপনার বলিতে এত বড় পৃথিবীতে কোথাও কিছু ছিল না,—এই তেরটি টাকা বেতনের উপরই তাহাদের সমস্ত নির্ভর, ইহার কিছুই মিথ্যা নয়।

তেরটি টাকা কি-ই বা! অথচ একটা দরিদ্র পরিবারের সমস্ত খাওয়া-পড়া, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-নিরানন্দ, মাসের পর মাস বছরের পর বছর ইহাকে আশ্রয় করিয়াই জীবনধারণ করিয়াছিল।

এই টাকা কয়টি কত তুচ্ছ। তাহার অসংখ্য জোড়া জুতার মধ্যে এক জোড়ার দামও ইহাতে কুলায় না। কিন্তু আজ একটা লোক নিজের জীবন দিয়া যখন ইহার সত্যকার মূল্য তাহার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল, তখন বুকের ভিতর যেন ঝড় বহিতে লাগিল। ঐ সারাদিনের উপবাসী ছেলেটার ফুলিয়ে ফুলিয়ে কান্নার শব্দ তাহার কানের মধ্য দিয়া কোথায় কি করিয়া যে বিঁধিয়া ফিরিতে লাগিল, সে তাহার কূল-কিনারা খুঁজিয়া পাইল না।

সেইখানে চুপ করিয়া বসিয়া আলেখ্যের কত দিনের কত অর্থ-ব্যয়ের কথাই না মনে পড়িতে লাগিল। তাহার নিজের, তাহার স্বর্গগত জননীর, তাহার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের, তাঁহাদের সভ্য-সমাজের কতদিনের কত উৎসব, কত আহার-বিহার, গান-বাজনার আয়োজন, কত বস্ত্র, কত অলঙ্কার, কত গাড়ি-ঘোড়া, ফুল-ফল, কত আলোর মিথ্যা আড়ম্বর,—তাহার পরিমাণ কল্পনা করিয়া তাহার শিরার রক্ত শীতল হইয়া আসিতে চাহিল। হাতের কাছে ছোট টিপয়ের উপরে নূতন আয়নার বিলটা পড়িয়া ছিল, তাহার অঙ্কের প্রতি চোখ পড়িতেই আজ তাহার প্রথম মনে হইল, এই বস্তুটার তাহার কতটুকুই বা প্রয়োজন, অথচ ইহারই মূল্যে একজন লোক অনায়াসে পাঁচ বৎসরকাল বাঁচিতে পারিত! আজ তাহার নিজের হাতে প্রাণ বাহির করিবার আবশ্যক হইত না।

আজ বিকালের গাড়িতে রে-সাহেবের বাড়ি আসিবার কথা। পিতার দুর্বলতার প্রতি তাহার অতিশয় অশ্রদ্ধা ছিল, ইহা সে মায়ের কাছে শিখিয়াছিল। পরের অন্যায়কে জোর করিয়া খণ্ডন করিতে পারেন না, তাঁহার চক্ষুলজ্জায় বাধে। এই দৌর্বল্যের সুযোগ লইয়া কত লোক তাঁহার প্রতি অসঙ্গত উৎপাত করিয়া আসিয়াছে, তিনি কোনদিন কোন কথা বলিতে পারেন নাই। এই-সকল পীড়নের শেষ করিয়া দিতে আলেখ্য বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়াছিল। প্রাচীন, অলস ও অকেজো লোকগুলাকে বিদায় দিবার প্রস্তাবের সামান্য একটুখানি প্রতিবাদ করিয়া যখন ব্রজবাবু পূর্বের কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন,—সাহেবের ইহাতে সম্মতি নাই, আলেখ্য তখন সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। পিতার চিরদিনের দুর্বলতা স্মরণ করিয়াই সে তাঁহার অবর্তমানেই এ সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আজ অক্ষম অতিবৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলী যখন তাহার স্বহস্তের মৃত্যু দিয়া সংসারের একটা অপরিজ্ঞাত দিকের পর্দা তুলিয়া ফেলিল, তখন সেইদিকে চাহিয়া এই অনভিজ্ঞ মেয়েটির গভীর পরিতাপের সহিত একলা বসিয়া অনেক নতুন প্রশ্নের সমাধান করিবার আবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। অনুপস্থিত শক্তিহীন পিতাকে স্মরণ করিয়া সে বারবার বলিতে লাগিল, চিত্তের কোমলতা এবং দুর্বলতা এক বস্তু নয় বাবা, তোমাকে আমরা চিরদিন ভুল বুঝিয়াছি, কিন্তু কোনদিন তুমি অভিযোগ কর নাই। সেই পিতাকে মনে করিয়াই আজ সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সংসার শুধুই একটা মস্ত দোকান-ঘর নয়। কেবল জিনিস ওজন করিয়া মূল্য ধার্য করিলেই মানুষের সকল কার্য সমাপ্ত হয় না। এখানে অক্ষমেরও বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে,—তাহার কাজ করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে বলিয়া তাহার জীবনধারণের দাবীও বিলুপ্ত করা যায় না।

আগে সকালে বিকালে কাছারি বসিত, আলেখ্য অন্যান্য অফিসের নিয়মে তাহাকে ১১টা হইতে ৪টায় দাঁড় করাইয়াছিল। এই সময়ের অনেকখানি সময় সে নিজে গিয়া ম্যানেজারের ঘরে বসিয়া কাজকর্ম দেখিত, আজ কিন্তু সে নিজের কর্মচারীদের কাছে মুখ দেখাইতে পারিল না, আপনাকে সেইখানেই আবদ্ধ করিয়া রাখিল। খাওয়া-দাওয়া তাহার ভাল লাগিল না এবং এমনই করিয়া যখন সারাবেলা কাটিল, তখন বৈকালের দিকে জানালা দিয়া দেখিতে পাইল, সাহেবের খালি গাড়ি স্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল, তিনি আসেন নাই। কোথাও আসা-যাওয়া সম্বন্ধে তাঁহার কথার কখনও ব্যতিক্রম হইত না; এই দিক দিয়া সে পিতার জন্য যেমন চিন্তা বোধ করিল, তাঁহার না আসায় আর একদিকে তেমনই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তিনি রাগ করিবেন না, একটি কঠোর বাক্য পর্যন্তও হয়ত উচ্চারণ করিবেন না, ইহা সে নিশ্চয় জানিত; কিন্তু তাঁহার ব্যথিত নিঃশব্দ প্রশ্নের সে যে কি জবাব দিবে, কোনমতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সেই কঠিন দায় হইতে সে আজিকার মত অব্যাহতি লাভ করিয়া যেন বাঁচিয়া গেল। এই শান্তিটুকু তখনও সে নিজের মধ্যে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল, বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল ঠাকুরমশাই আপনার

সঙ্গে দেখা করতে চান।

কে ঠাকুরমশাই? কোথায় তিনি?

ঠিক পর্দার আড়াল হইতে উত্তর আসিল—আমি অমরনাথ, এই বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি।

'আসুন' বলিয়া আহ্বান করিয়া আলেখ্য উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যাখ্যান করিবার সময় বা সুযোগ তাহার রহিল না।

আলেখ্য হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, কিন্তু সেদিনের মত আজও অধ্যাপক সোজা দাঁড়াইয়া রহিলেন, নমস্কার ফিরাইয়া দিবার চেষ্টামাত্র করিলেন না। আলেখ্য লক্ষ্য করিল, কিন্তু কাহারও কোনপ্রকার আচরণেই ত্রুটি ধরিবার মত মনের জোর আজ আর তাহার ছিল না।

অধ্যাপক নিজেই আসন গ্রহণ করিলেন। কহিলেন, অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনেই আপনার কাছে আজ আমাকে আসতে হয়েছে, না হলে আসতাম না।

এই মানুষটি গ্রামের সকল কাজেই আছেন, অতএব তিনি যে নয়ন গাঙ্গুলীর ব্যাপারেই আসিয়াছেন, আলেখ্য মনে মনে তাহা বুঝিল, এবং পিতার অবর্তমানে তাঁহাকে কি জবাব দিবে, চক্ষুর নিমেষে স্থির করিয়া লইয়া শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—বলুন।

অধ্যাপক একটুখানি হাসিলেন, বলিলেন—আজ আপনি নিজের মধ্যে যে কত দুঃখ পেয়েছেন, সে আর কেউ না জানলেও আমি জানি। সে আলোচনা করতে আমি আসিনি, আমি আপনার শত্রু নই।

আলেখ্যের বোধ হইল, এই লোকটি যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছে, কিন্তু নিজেকে সে চঞ্চল হইতে দিল না, তেমনই সহজভাবেই কহিল—আপনার প্রয়োজন বলুন।

অধ্যাপক কহিলেন—বলছি। কাল হাটের দিন, শহর থেকে পুলিশ এসে এর মধ্যেই সমস্ত ঘিরে ফেলেছে। এ কাজ আপনি কেন করতে গেলেন?

আলেখ্য চমকিত হইল। এখানে আসার পরদিনই সে বিশেষ কোন অনুসন্ধান বা চিন্তা না করিয়াই জিলার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একখানা চিঠি পাঠাইয়া দিয়াছিল। হাটের সম্বন্ধে যে-সকল কথা সে লিখিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই অতিরঞ্জিত বা সত্য-মিথ্যায় বিজড়িত। ইহার ফলাফল সে ঠিক জানিত না এবং বিলম্ব দেখিয়া ভাবিয়াছিল, হয়ত সে চিঠি পৌঁছায় নাই, কিংবা পৌঁছালেও ম্যাজিস্ট্রেট ইহার কিছুই করিবেন না। এতদিনের ব্যবধানে চিঠির কথা সে নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল, অকস্মাৎ আজ এই খবর।

আলেখ্য নরম হইয়া বলিল—বেশ ত, এলেই বা তারা, কি এমন ক্ষতি?

অধ্যাপক কহিলেন—আপনি বিদেশে ছিলেন, জানেন না, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, সহজে এর শেষ হবে না দু'চারজন মারাও যদি যায় ত আমি আশ্চর্য হব না।

আলেখ্য ভীত হইয়া বলিল—মারা যাবে? কে মারা যাবে?

অধ্যাপক কহিলেন—কে মারা যাবে, কি বলবো? হয়ত আমিও যেতে পারি।

আপনি?

বিচিত্র কি? আত্মসম্মানের জন্যে যদি মরবার প্রয়োজনই হয়, আমাকেই ত সকলের আগে যেতে হবে। কিন্তু সব কথা আপনাকে বলবার এখন আমার সময় নেই, আমাকে অনেকদূরে যেতে হবে। কাল সকালে কি একবার দেখা হতে পারে?

আলেখ্য ব্যগ্র হইয়া বলিল—পারে। আপনি যখনই আমাকে ডেকে পাঠাবেন, আমি তখনই এসে হাজির হব। বাবা নেই, আমাকে কিন্তু আপনি মিথ্যে ভয় দেখাবেন না।

তাঁহার ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে আক্রমণের লেশমাত্রও ছিল না, অধ্যাপক শুধু একটু-খানি হাসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—না, ভয় দেখানো আমার অভ্যাস নয়, কিন্তু কাল যেন সত্যই আপনার দেখা পাই। —এই বলিয়া যেমন সহজে আসিয়াছিলেন, তেমনই সহজে বাহির হইয়া গেলেন। ('মাসিক বসুমতী', পৌষ ১৩৩০)

চার

সন্ধ্যা সবেমাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু চাকররা তখন পর্যন্ত ঘরে আলো দিয়া যায় নাই। শ্রান্তি, পরিতাপ ও দুশ্চিন্তার গুরুভারে আলেখ্য সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, উপরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িবার জোরটুকুও যেন তাহাতে ছিল না, এমন সময়ে একজন অতিশয় বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক বলা নাই, কওয়া নাই, দ্বারের পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আলেখ্য বিস্মিত ও বিরক্তচিত্তে সোজা হইয়া বসিয়া কহিল—কে?

বৃদ্ধটি সম্মুখের একখানি চেয়ার সযত্নে ও সাবধানে টানিয়া লইয়া বসিতে বসিতে কহিলেন—আমার নাম নিমাই ভট্টাচার্য, দূরসম্পর্কে অমরনাথের আমি ঠাকুরদাদা হই,—আর শুধু অমরনাথের বলি কেন, এ অঞ্চলে সকলেরই আমি ঠাকুর্দা, আমার চেয়ে বুড়ো আর এদিকে কেউ নেই। তোমার বাবা রাধামাধবও ছেলেবেলায় আমাকে খুড়ো বলে ডাকতেন। কাশীতে ছিলাম, হঠাৎ যে গরম পড়েছে, টিকতে পারলাম না। যে যাই বলুক দিদি, বাঙ্গালাদেশের মত দেশ আর নেই—যেন স্বর্গ। এখানে এসে কেমন আছ? বাবা ভাল আছেন?

আলেখ্য ঘাড় নাড়িয়া কহিল—হাঁ, তিনি ভাল আছেন। আপনার কি প্রয়োজন? বাবা কিন্তু আজ বাড়ি নেই।

নিমাই বলিলেন—কিন্তু তাঁর ত আজ ফেরবার কথা ছিল?

আলেখ্য কহিল—ছিল, কিন্তু যে কারণেই হোক ফিরতে পারেননি। কাল তিনি এলে আপনি দেখা করবেন।

বৃদ্ধ আলেখ্যের মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—

না দিদি, আমার বেশ সচ্ছল অবস্থা, আমি ভিক্ষের জন্য আসিনি। অমরনাথের মুখে শুনেছি, তুমি নাকি বিলেত পর্যন্ত গেছ। ভাল লেখাপড়া-জানা মেয়েদের আমি বড় ভালবাসি। তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইবার আমার ভারী লোভ, কিন্তু কখনও সে সুযোগ পাইনি। তারা আমার মত একজন নগণ্য বুড়োমানুষের সঙ্গে কথা কইতে চাইবেই বা কেন? তাই ভাবলাম, ঘরের কাছে যদি এতবড় সুবিধে পাওয়াই গেছে ত ছাড়া হবে না। ক'টা দিনই বা বাঁচবো, কিন্তু বুড়োর উপর তুমি ত মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছ, না দিদি?

আলেখ্য মনে মনে লজ্জা পাইয়া সবিনয়ে কহিল—আজ্ঞে না, শুধু আজ বড় ক্লান্ত ছিলাম বলেই—

নিমাই বলিলেন—সে আমি শুনেছি দিদি, অমরনাথ আমার কাছে সমস্ত বলেই তবে গেছেন। বড় বড় ছেলে, এতখানি বয়সে তার আর জোড়া কোথাও দেখলাম না। পাগলা দুঃখের জ্বালা সইতে পারলে না, আপনাকে হত্যা করে ফেললে,—আহা! তাই ভাবি, দিদি, ভগবান শক্তি হরণ করে নিলে মানুষ কি-ই বা! আসবার পথে তাদের বাড়ির পাশ দিয়েই আসছিলাম, শ্মশান থেকে এখনও তারা ফেরেনি, ভেতরে মেয়েটা ডাক ছেড়ে চেঁচাচ্ছে,—আহা! সংসারে লঘু পাপে কত গুরু দণ্ডই না হয়! জিনিস হয়ে বয়ে চুকে যায়, কিন্তু দাগ তার সারা জীবনে মিলোয় না। ভাবলাম, একবার ভেতরে ঢুকে গিয়ে বলি, দুর্গা, অভিসম্পাত করে আর লাভ কি মা, সে যদি জানত, এতবড় ভয়ানক কাণ্ড হবে, তা হলে কি কখনও তোমার বাবাকে জবাব দিতে পারতো? তাকে আমি চিনিনে, তবু বলছি কখখনো না। যা হবার তা হয়েছে, কিন্তু যে বেঁচে রইল, তার মনস্তাপ কি কখনও ঘুচবে! এ কলঙ্কের দাগে তাকে চিরকাল দাগী হয়ে থাকতে হবে। অথচ তলিয়ে দেখলে এ ত সত্য নয়। তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি দিদি, তার মেয়ের চেয়ে এ দুর্ঘটনা তোমাকে ত কম আঘাত করেনি।

এই আগন্তুকের অবাঞ্ছিত আগমনে আলেখ্যের পীড়িত চিত্ত তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মন্তব্য শেষ হইলে সে সবিস্ময়ে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে কে বললে আমি আঘাত পেয়েছি?

বৃদ্ধ কহিলেন—অমরনাথ আমাকে ত তাই বলে গেলেন।

আলেখ্য তেমনিই আস্তে আস্তে বলিল—অমরনাথবাবুর এরূপ অনুমানের হেতু কি, তা তিনিই জানেন। গাঙ্গুলীমশাই সম্পূর্ণ কাজের বার হয়ে গিয়েছিলেন। আমার জমিদারি সুশৃঙ্খলায় চালাবার চেষ্টা করা ত আমার অপরাধ নয়।

নিমাই বলিলেন—তোমার অপরাধের উল্লেখ ত সে একবারও করেনি দিদি।

তাহার জবাব শুনিয়া বৃদ্ধ অন্ধকারে ঠাহর করিয়া তাহার মুখের চেহারা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়া শেষে একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন—কর্তব্যের কি

বাঁধাধরা কোন হিসেব আছে ভাই, যে, এই শক্ত সোজা জবাবটা দিয়েই এ সত্তর বছরের বুড়োটাকে ঠকিয়ে দেবে ? বুদ্ধিহত অক্ষম এই যে দুঃখী মানুষটা তোমার অন্নেই চিরদিন প্রতিপালিত হয়ে অবশেষে তোমার ভয়েই কূল-কিনারা না পেয়ে নিজের প্রাণটাকে হত্যা করে সংসার থেকে বিদায় নিলে, কর্তব্যের দোহাই দিয়ে কি এর দুঃখকে ঠেকানো যায় দিদি ? নিরুপায় মেয়েটা তার শোকে চেঁচাচ্ছে, তার উপবাসী নাতিটা গেছে কাঁদতে কাঁদতে শ্মশানে – এর দুঃখের কি আদি-অন্ত আছে ? আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দিদি, একলা ঘরের মধ্যে বসে ব্যথায় তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে।—এই বলিয়া বৃদ্ধ উত্তরীয়-প্রান্তে নিজের দুটি আর্দ্র চক্ষু মার্জনা করিতে গিয়া সহসা সম্মুখে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এতক্ষণ আলেখ্য কোনমতে সহিয়াছিল, কিন্তু কথা তাঁহার সম্পূর্ণ শেষ না হইতেই সুমুখের টেবুলে সজোরে মাথা রাখিয়া একেবারে হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বুড়া নিমাই নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। অসময়ে সান্ত্বনা দিয়া তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টামাত্র করিলেন না। মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে কাটিলে আলেখ্য উঠিয়া বসিয়া নিজের চোখ মুছিতে লাগিল।

এতক্ষণে নিমাই কথা কহিলেন। সস্নেহ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন এ আমি জানতাম দিদি। এ নইলে কিসের শিক্ষা, কিসের লেখাপড়া! এতবড় জমিদারির বোঝা সাধ্য কি তোমার বইতে পার!

কোন কারণে কাহারও কাছেই বোধ করি এমন করিয়া আলেখ্য আপনার দুর্বলতা প্রকাশ করিতে পারিত না, কিন্তু আজ সে এই অপরিচিতের কাছে নিজে মর্যাদা বাঁচাইবার এতটুকু চেষ্টা করিল না। হয়ত সে শক্তিও তাহার ছিল না। অশ্রুরুদ্ধ ভগ্নস্বরে সহসা বলিয়া উঠিল—আপনাদের দেশে এসেছিলাম আমি থাকতে, কিন্তু এর পরে এখানে মুখ দেখাতেও পারব না।

বৃদ্ধ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—এ লজ্জা যে তোমার মিথ্যে, এ মিথ্যে সান্ত্বনা তোমাকে আমি দেব না। কিন্তু সমস্ত যদি চিরকালের মত ত্যাগ করে যেতে পারো, তবেই এ যাওয়ার অর্থ হবে, নইলে যতদূরেই কেন যাও না, এই রস শোষণ করেই যদি তোমাকে জীবনধারণ করতে হয় ত আর একজনের জীবন-হরণের পাপ থেকে তুমি কোনদিন মুক্তি পাবে না। এখানকার লজ্জা সেখানে চাপা দিয়েই যদি মুখ দেখাতে হয় দিদি, আমি বলি, তা হলে লোক ঠকিয়ে আর কাজ নেই। তুমি এখানেই থাকো।

আলেখ্য বলিল—কিন্তু আমি যে সত্যিকার অপরাধ কিছু করিনি, এখানকার লোকে ত তা বুঝতে চাইবে না।

নিমাই কহিলেন—বুঝতে চাওয়া ত উচিতও নয়।

আলেখ্য সহসা একটু কঠিন হইয়া বলিল—এ কথা আমি কোনমতেই স্বীকার করতে পারিনে।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের উপরেই জবাব দিলেন—আজ হয়ত পার না, কিন্তু আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, আর একদিন যেন এ সত্য সবিনয়ে স্বীকার করার মত সাহস তোমার হয়।

ভৃত্য বাতি দিয়া গেল। সেই আলোকের সম্মুখে আলেখ্য কিছুতেই মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। নিমাই কহিতে লাগিলেন—তুমি শিক্ষিতা মেয়ে, অনেক দূর থেকে তোমাকে আমি দেখতে এসেছি। যে শিক্ষা তুমি পেয়েছ, হয়ত সে কেবল এই কথাই তোমাকে শিখাতে চেয়েছে যে, এ দুনিয়ায় যোগ্যতাটাই একমাত্র এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু আমাদের এই সোনার দেশ কোনদিন কিছুতে এ কথা স্বীকার করেনি। এদেশে অক্ষম দুর্বল, একান্ত অযোগ্যেরও দুটো ভাত-কাপড়ের দাবী আছে। অযোগ্যতার অপরাধে বাঁচার অধিকার থেকে সংসারে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না, কিন্তু গাঙ্গুলীকে তাই তুমি করলে; তাদের সকল দুঃখের ইতিহাস শুনেও তোমার খাতা লেখবার যোগ্যতা দিয়েই শুধু তার প্রাণের মূল্য ধার্য করে দিলে। তুমি স্থির করলে, যে তোমার খাতা লিখতে আর পারে না, তার খাওয়া-পরার ওই ক'টা টাকা খরচ না হয়ে তোমার সিন্দুকে জমা হওয়াই দরকার। এই না দিদি?

আলেখ্যর কণ্ঠস্বর পুনরায় রুদ্ধ হইয়া আসিল কহিল,—আমি কখ্খনো এত কথা ভেবে করিনি। আমি কিছুতেই এত হীন নই।

নিমাই বলিলেন—সে আমি জানি, তাই ত আমি তোমার শিক্ষার কথা আমি বলছিলাম দিদি। অমরনাথ বলছিলেন, তোমার জামা-কাপড়-জুতো-মোজার খরচ,—তিনি বলছিলেন, তোমার আয়না-চিরুনি-সাবান-গন্ধের অত্যন্ত ব্যয়; একজনের ভাত-কাপড়ের প্রয়োজনের চেয়ে আর একজনের এইগুলোর প্রয়োজন যে কোন অবস্থাতেই বড় হতে পারে, এ কুশিক্ষা যদি কোথাও পেয়ে থাক ত সে তোমাকে আজ ভুলতে হবে। যারা জন্মেছে, তারা যত দুর্বল, যত অক্ষম, যত পীড়িতই হোক, বাঁচবার অধিকারে তাদের কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এ সত্য তোমাকে শিখতেই হবে। এত বড় জমিদারির দৈবাৎ আজ তুমি মালিক, তাই তোমার বিলাসিতার উপকরণ যোগাতে আর একজনকে অনাহারে আত্মহত্যা করতে হবে, এ ত হতেই পারে না; এবং যে সমাজবিধানে এতবড় অন্যায় করাও তোমার পক্ষে আজ সহজ হতে পারলে, এ বিধান যতদিনেরই প্রাচীন হোক, কিছুতেই এটা মানুষের সমাজের চূড়ান্ত এবং শেষ বিধান হতে পারে না। আমি বুড়ো হয়েছি, সেদিন চোখে দেখে যাবার আমার সময় হবে না, কিন্তু এ কথা তুমি নিশ্চয় জেনো দিদি, অক্ষম অকর্মণ্য বলে আজ যাদের তোমরা বিচারের ভান করছ, তাদেরই ছেলেপুলেদের কাছে আর একদিন তোমাদেরই কর্মপটুতার জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন মনুষ্যত্বের আদালতে কেবল জমিদারির মালিক বলেই আরজি পেশ করা চলবে না।

আলেখ্য তাহার কথাগুলি যে বিশ্বাস করিল তাহা নয়। বরঞ্চ, আর কোন

সময়ে এই সকল অপ্রিয় কঠিন আলোচনায় সে মনে মনে ভারী রাগ করিত। কিন্তু আজিকার দিনে কতক কৌতূহলবশে, কতক বা লজ্জায় ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—প্রজারা কি বিদ্রোহ করবে আপনি বলছেন? তাদের কি সব এইরকম মনের ভাব?

নিমাই কহিলেন—দিদি, বিদ্রোহ শব্দটা শুনতে খারাপ, অনেকেই ওটা পছন্দ করে না, এবং মনোভাব জিনিসটা অত্যন্ত অস্থির বস্তু। ওর নিজের কোন ঠাঁই নেই অর্থাৎ ওটা নিছক অবস্থা এবং শিক্ষার ফল। এরা কাঁধ মিলিয়ে দ্রুতবেগে যেদিকে চলেছে, আমি শুধু তার দিকেই তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এদের ঠেকাতে না পারলে ওকেও ঠেকাতে পারা যাবে না। জগতে বুদ্ধিমানরা এতকাল তাদের আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, আজ হঠাৎ তাদের ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম ভেঙ্গে গেছে। পেট না ভরলে আর যে তারা নীতির বচন এবং পুরানো আইন-কানুনের চোখ-রাঙানিতে থামবে এমন ত ভরসা হয় না দিদি।

আলেখ্য কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি বলেন এ-সমস্তই তবে বিলাতী শিক্ষার দোষ?

বৃদ্ধ কহিলেন আমি দোষের কথা ত একবারও বলিনি দিদি। আমি বলি, এ তার ফল।

আলেখ্য কহিল—কুফল।

বৃদ্ধ হাসিলেন। বলিলেন—কথাটা একটু গুলিয়ে গেল ভাই। তা যাক। আমি সুফল-কুফলের উল্লেখ করিনি, শুধু ফলের কথাই বলছিলাম। ভাল, সেই কথাই যদি উঠলো, তবে বলি দিদি, আমার জীবনেই আমি দেখেছি, ছ'টা পয়সা ও এক পাতা দোক্তার বদলে একটা লোক সারাদিন মজুরী করে তার পরিবার প্রতিপালন করেছে। দুঃখে নয়, সচ্ছলে—আনন্দের সঙ্গে। দেশে টাকা ছিল না, কিন্তু প্রচুর খাদ্য ছিল। রেল ছিল না, জাহাজ ছিল না—বিদেশী সাহেব আর ততোধিক বিদেশী মারবাড়ীতে মিলে দেশের অন্ন বিদেশে চালান দিয়ে তখন সহস্র কোটি লোকের জীবন-সমস্যা এমন দুঃসহ, এমন ভীষণ জটিল করে তোলবার সুযোগ পেত না। তখন ক্ষুধাতুরের মুখের গ্রাস জুয়ার আড্ডার মধ্যে দিয়ে এমন করে সোনা-রুপোয় রূপান্তরিত হয়ে যোগ্যতমের সিন্দুকে গিয়ে উপস্থিত হ'ত না—বলিতে বলিতে হঠাৎ বৃদ্ধের দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, কহিলেন—দিদি, আমার ছেলেবেলায় অক্ষম অযোগ্যের বেঁচে থাকবার অধিকার নিয়ে এমন নিষ্ঠুর পরীক্ষা ছিল না। আজ একমুঠো শাকান্নও দেশে নষ্ট হবার নয়, বুদ্ধিমান ও ব্যবসায়ীতে মিলে তাঁবার টুকরোয় তাকে দাঁড় করাতে দেরি করে না—অর্থবিজ্ঞানের পণ্ডিতরা বলবেন, এর চেয়ে মঙ্গল আর কি আছে। কিন্তু আমার মত যাকে গ্রামে গ্রামে দুঃখীদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াতে হয়, সেই জানে মঙ্গল এতে কত!

এই বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ও মুখের ভাবে আলেখ্যের নিজের চিত্তও করুণ হইয়া আসিল, সে আপনাকে সমলাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—ট্রেন ও ষ্টীমারকে আপনি

ভাল মনে করেন না ?

বৃদ্ধ হাসিয়া ফেলিলেন।—কহিলেন—কোন কিছুর ভাল-মন্দই কি এমন বিচ্ছিন্ন করে নির্দেশ করা যায় দিদি ? আর সকলের সঙ্গে যুক্ত করে, সামঞ্জস্য করে তবেই তার ভাল-মন্দের সত্যকার বিচার হয়।

আলেখ্যও হাসিল, কহিল—ওটা শুধু আপনার কথার মারপ্যাঁচ। আসল কথা, আপনাদের পণ্ডিত সমাজ বিলাতী শিক্ষার অত্যন্ত প্রতিকূলে। ওদের যা-কিছু সমস্তই মন্দ এবং আপনাদের যা-কিছু সমস্তই ভাল, এই আপনাদের বদ্ধমূল ধারণা। যতক্ষণ না তাদের বিদ্যা, তাদের বিজ্ঞান আপনারা আয়ত্ত করবেন, ততক্ষণ কোনমতেই নিরপেক্ষ বিচার করতে পারবেন না।

বৃদ্ধ ক্ষণকাল নতমুখে চিন্তা করিয়া চোখ তুলিয়া চাহিলেন বলিলেন দিদি, নিজের মুখে নিজের পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, কিন্তু তোমার কথায় মনে হয় যেন, আচরণে আমার আত্মগোপনের অপরাধ হচ্ছে। সেকালে আমি একজন বড় অধ্যাপক ছিলাম। অমরনাথ আমারই ছাত্র। আমার কাছ থেকেই সে এম. এ পাস করে, তার সংস্কৃত শিক্ষার গুরুও আমি। তুমি যে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের কথা বললে, তা আয়ত্ত করতে পারিনি, কিন্তু একেবারে অনভিজ্ঞ বললেও মিথ্যা-ভাষণের পাপ হবে।

কথাটা শুনিয়া আলেখ্য চমকিয়া উঠিল, তাহাকে কে যেন মারিল। সেই তাহার আরক্ত মুখের প্রতি বৃদ্ধ নিঃশব্দে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—আজ তুমি শ্রান্ত, তুমি উপরে তোমার ঘরে যাও দিদি, অমরনাথ কোন বিপদে যদি না পড়ে থাকে ত কাল এসে দু'জনে আবার দেখা করব। আমিও চললাম,—এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া পুনশ্চ কি একটা যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু সহসা আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। ('মাসিক বসুমতী', চৈত্র ১৩০০)

পাঁচ

পরদিন বাড়ি ফিরিয়া রে সাহেব নয়ন গাঙ্গুলীর আত্মহত্যার বিবরণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মেয়েকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সোজা তাহাদের বাড়ি চলিয়া গেলেন। এতটা আলেখ্য আশা করে নাই। বিকালবেলা যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন মুখ তাহার কথঞ্চিৎ প্রসন্ন, তথাপি এ সম্বন্ধে চুপ করিয়াই রহিলেন। সেখানে কি বলিলেন, কি করিলেন, আলেখ্য তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। সেদিনটা এইভাবেই কাটিল। পরদিন সকালে একখানা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া আলেখ্য পিতাকে কহিল—মিস্টার ঘোষ ইন্দুকে নিয়ে বোধ করি সন্ধ্যার ট্রেনেই এসে পৌঁছবেন।

কে, ঘোষ-সাহেব ?

আলেখ্য মাথা নাড়িয়া বলিল—না, কমলকিরণ। ঘোষ সাহেব এবং ইন্দুর মা বোধ হয় পাঁচ-ছ'দিন পরে আসবেন।

পিতা কহিলেন—আচ্ছা।

আলেখ্য কহিল—তাদের অভ্যর্থনার উপযুক্ত কিছুই বন্দোবস্ত করে উঠতে পারিনি।

পারনি? এই পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যে কি হতে পারবে না মনে হয়?

আলেখ্য পূর্বের মত মাথা নাড়িয়া কহিল, সম্ভব নয় বাবা—এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, একটা অত্যন্ত বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেছে বাবা, তুমি বোধ হয় শুনেচ? কি দুঃখের বিষয়।

সাহেব বলিলেন, হাঁ।

তাদের সম্বন্ধে কি কোনরকম ব্যবস্থা করলে বাবা?

না, বিশেষ কিছুই করা হয়নি—এই বলিয়া সাহেব নীরব হইলেন। মেয়েকে তিনি কোনদিনই তিরস্কার করেন নাই, বিশেষতঃ সমস্ত মরিয়া ঝরিয়া গিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে সংসারের সর্বপ্রকার বন্ধন যখন এই কন্যাটিতেই স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তখন হইতে এই মেয়ের কাছেই আপনাকে তিনি ধীরে ধীরে শিশুর মত করিয়া তুলিয়াছেন। সে-ই তাঁহার সর্ববিষয়ে অভিভাবক। তাহার বিরুদ্ধে বা অমতে কাজ করার শক্তি তাহার স্বভাবতঃই তিরোহিত হইয়াছে।

আলেখ্য কহিল—উপযুক্ত ব্যবস্থা কেন করে এলে না বাবা?

সাহেব বলিলেন—মা, বিষয় তোমার। সমস্ত তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি ছুটি নিয়েছি, এর ভাল মন্দর ভার তোমার। যা কর্তব্য, তা তুমিই করবে।

আলেখ্য করুণকণ্ঠে কহিল—যদি বুঝতে না পেরে কোন অন্যায় করি বাবা, তবুও কি তুমি তার প্রতিকার করবে না?

পিতা বলিলেন—আমিই কি বড় বুদ্ধিমান? অন্ততঃ সংসারে সে প্রমাণ ত আজও দিতে পারিনি মা। আর, না বুঝে অন্যায় যদি কিছু করেই থাক, যিনি বুদ্ধি দেবার মালিক, তিনিই তোমাকে তার নিবারণের পথ বলে দেবেন।—এই বলিয়া বৃদ্ধের সজল দৃষ্টি একমুহূর্তে খোলা জানালার বাহিরে গিয়া অকস্মাৎ কোন্ অনির্দেশ্য শূন্যতায় স্থিতিলাভ করিল। পিতার ঠিক এই ভাবটি আলেখ্য পূর্বে কখনও লক্ষ্য করে নাই—সে যেন অবাক হইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতে তাঁহাকে সে ষোল-আনা সাহেব বলিয়াই জানে। ধর্মমত লইয়া তিনি আলোচনা করিতেন না ঈশ্বরে ভক্তি-বিশ্বাস আছে কি নাই, এ কথাও কোনদিন প্রকাশ করিতেন না, এবং করিতেন না বলিয়াই লোকের ঘরে-বাহিরে তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া ধারণা ছিল। অথচ, সাবেক দিনের ক্রিয়া-কর্ম ঠাকুর-দেবতার পূজা-অর্চনা সমস্তই অব্যাহত ছিল। এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে আলেখ্যের জননী ইহাকে ভয় এবং দুর্বলতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, আলেখ্যের নিজেরও তাহাতে

সংশয় ছিল না, কিন্তু বৃদ্ধ পিতার আজ এই অদৃষ্টপূর্ব মুখের চেহারা চক্ষের পলকে যেন তাহাকে আর একটা দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

আলেখ্য ধীরে ধীরে বলিল—তুমি বেঁচে থাকতে আমাকে এ-দায়িত্ব দিয়োনা বাবা।

কেন মা ?

আমি আদেশ তোমার লঙ্ঘন করেছি।

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি আদেশ আলো ? আমার ত কোন আদেশের কথাই মনে পড়ে না মা !

আলেখ্য অধোমুখে অঞ্চলের পাড়টা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে চুপ করিয়া রহিল।

পিতা কহিলেন—কৈ, বললে না যে ?

আলেখ্য তথাপি কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অভিমানরুদ্ধ-স্বরে আস্তে আস্তে বলিল—তবে এসে পর্যন্ত আমার সঙ্গে তুমি কথা কও না যে বড় ? আমি ত এক শ'বার স্বীকার করছি, বাবা, আমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছি। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি, আমাকে তিনি এত বড় শাস্তি দিয়ে যাবেন। আমি তোমার কাছেও মুখ দেখাতে পারছি নে বাবা, আমি এদেশে আর থাকবো না।—এই বলিয়া সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সাহেব কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন,—কিছু বলিলেন না। এমনিভাবে কিছুক্ষণ কাটিল, বোধ হয় মিনিট পাঁচ-ছয়ের বেশী নয়, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে তাহার দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ পিতার যে পরিচয় আলেখ্যের ভাগ্যে জুটিল, তাহা যেমন অভাবনীয়, তেমনি মধুর। এই বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে ইহার আভাস পর্যন্তও কখনও তাহার চোখে পড়ে নাই। আজ মায়ের জন্য তাহার ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল, এত বড় মাধুর্যের কোন আস্বাদই তিনি জীবনে উপভোগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। পিতা সমাজে কখনও যান নাই, উপাসনায় কোন দিন যোগ দেন নাই, ভগবৎ-বিশ্বাসহীন নাস্তিক বলিয়া মনে মনে জননীর যেমন ক্ষোভ ছিল, স্বামীর চিত্ত দৌর্বল্যের জন্যও পরিচিত আত্মীয়বন্ধুজনের সমক্ষেও তাঁহার তেমনি লজ্জার কারণ ছিল। পিতার প্রতি আলেখ্যের স্নেহ ও প্রীতি সংসারে কোনও সন্তানের চেয়েই হয়ত কম ছিল না, কিন্তু পুরুষোচিত শক্তি, সামর্থ্য ও দৃঢ়তার অভাব এই রোগ জীর্ণ নিরীহ লোকটির বিরুদ্ধে আরোপ করিয়া মায়ের নিকট হইতে একটা করুণ অশ্রদ্ধার ভাবই সে উত্তরাধিকারের মত পাইয়াছিল। সেই পিতাকে অকস্মাৎ আজ সে এক সম্পূর্ণ নূতন দিক হইতে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় একেবারে বিগলিত হইয়া গেল। এমন করিয়া সে একটা দিনও তাহাকে দেখিবার সুযোগ পায় নাই। নানা লোকের নানা উক্তি ও বিভিন্ন মতামত দিয়া এই দিকটাই যেন

তাহার চোখের সম্মুখে একেবারে আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া ছিল। আজ অনুশোচনায় ও আত্মধিক্কারে হৃদয় পূর্ণ করিয়া সে পিতার স্নেহস্পর্শের নীচে নিঃশব্দে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, হয়ত পিতা নিজের মত দুর্বল ও শক্তিহীন জানিয়াই তাঁহার বহুদিনের আশ্রিত অতিবৃদ্ধ গাঙ্গুলীকে মনে মনে স্নেহ করিতেন, তাঁহার প্রতি এত বড় কঠিন অবিচার হইয়া গেল, তিনি নিবারণ করিতে পারিলেন না, তাই নীরবে তাঁহার শোকাচ্ছন্ন কন্যা-দৌহিত্রের কাছে গিয়া তেমনি নীরবে কি যে করিয়া আসিলেন, কাহাকেও জানিতে দিলেন না, অথচ এতবড় অন্যায় যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল, তাহাকে একটি ক্ষুদ্র তিরস্কারেও লাঞ্ছিত করিলেন না, দুই বিভিন্ন দিকের সমস্ত ব্যথাই নির্বাক হইয়া নিজের বুক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। অপরাধী কন্যাকে যে ভার, যে দায়িত্ব একদিন তিনি নিজের হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিয়া আর তাহার লজ্জার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন না। বাহিরের লোকের কাছে হয়ত ইহা দুর্বলতার নামান্তর বলিয়াই প্রতিভাত হইবে, কিন্তু আলেখ্য আজ তাহার নবলব্ধ দৃষ্টি দিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কত বড় বিশ্বাস ও স্নেহের শক্তি ইহারই মধ্যে সহজে আত্মগোপন করিয়া আছে।

আলেখ্য অঞ্চলে চোখ মুছিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা! সংসারের ভার আর যদি তুমি ফিরে নিতে না চাও, আমাকে কি তুমি পথ দেখিয়েও দেবে না?

সাহেব হাসিয়া কহিলেন—তুমি ত জান মা, সংসারযাত্রায় আমি দ্রুতপদে চলতে পারিনি—সকলের পিছনেই আমি পড়ে গেছি। সেই পিছনের পথটাই আমি কেবল দেখাতে পারি, কিন্তু সে ত সকলের মনোমত হবে না।

আলেখ্য কহিল—আমার হবে বাবা।

সাহেব বলিলেন—যদি হয় নিয়ো; কিন্তু নিতেই হবে, তা কোনদিন মনে ক'রো না।

আলেখ্য ক্ষণকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—আমরা সবাই মিলে যখন দৌড়ে চলেছিলাম, তখন কেন যে তুমি পেছিয়ে চলতে বাবা, আজ যেন তার আভাস পেয়েছি। এখন থেকে যেন তোমার পায়ের দাগ ধরেই চলতে পারি বাবা, আমাকে তুমি সেই আশীর্বাদ কর।

সাহেব আসিয়া তাহার মাথায় আর একবার হাত বুলাইয়া দিয়া শুধু কহিলেন—পাগলি! এই বুড়োর সঙ্গে কি তোরা চলতে পারবি মা? সে ধৈর্য কি তোদের থাকবে?

আলেখ্য বলিল—তোমাকে দেখে আজ এই কথাটাই সবচেয়ে বেশী মনে হচ্ছে বাবা, কেবল দৌড়ে বেড়ানোই এগোনো নয়। তাই, তুমি যখন ধীরে ধীরে পা ফেলে চলতে, আমরা সবাই ভাবতুম, তুমি পেছিয়ে পড়ছ। আজ থেকে তোমার পায়ের চিহ্নই যেন সকল পথে আমার চোখ পড়ে।

সাহেব স্থির হইয়া রহিলেন। কিন্তু সে হাতখানি তাঁহার তখনও আলেখ্যের মাথার 'পরে ছিল, সেই পাঁচ আঙুলের স্পর্শ দিয়া যেন পিতার অন্তরের আশীর্বাদ কন্যার সর্বাঙ্গে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

খানিকক্ষণ এমনি নিঃশব্দে কাটিবার পরে আলেখ্য কহিল—বাবা, কাল তোমার খুড়ো-মশাই এসেছিলেন।

খুড়ো-মশাই? সাহেব সবিস্ময়ে কন্যার প্রতি চাহিলেন।

কন্যা কহিল—ছেলেবেলায় তাঁকে তুমি এই বলে ডাকতে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। নিমাই ভট্টাচার্য্য নাম।

সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি বেঁচে আছেন? এত বড় আসল মানুষ সহজে মেলে না, মা। তাঁর কোনরূপ অমর্যাদা হয়নি তো?

আলেখ্য মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। কহিল, তিনি এসেছিলেন আমার পরিচয় নিতে এবং তাঁর ছেলেবেলায় এই ঐশ্বর্যময়ী বাংলাদেশে যে কত ঐশ্বর্য ছিল তার পরিচয় দিতে। সে কি আশ্চর্য ছবি বাবা! ফুলে-ফলে, শস্যে-ধানে শোভায়-স্বাস্থ্যে কি সম্পদই না এদেশের ছিল! আমার ভুলের সীমা নেই, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই,—এ কথা আমি স্বপ্নেও অস্বীকার করিনে, কিন্তু আমার মত একটা সামান্য মেয়ের অন্যায়ের ফলে যে-দেশে এত বড় মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারে, তাকে নিবারণ করবার কোন সম্বল যে-দেশের হাতে নেই, সর্বরকমে কাঙাল করে যারা এই সোনার দেশকে এতবড় নিঃস্ব-নিরুপায় করে তুলেছে, তাদের অপরাধেরই কি অবধি আছে বাবা?

সাহেব গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন—হুঁ। তখনকার দিনে উপবাসের ভয়ে যে তাঁকে আত্মহত্যা করতে হ'ত না, সে ঠিক। চাকরি গেলেও তাঁরা না খেয়ে মরতেন না। গ্রামের মধ্যে দু'মুঠো অন্ন তাঁদের জুটতো।

আলেখ্য বলিল,—অক্ষম অপারক বলে আমার ভুল ত সে থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে পারত না! এবং এত বড় কলঙ্কের ছাপ ত সে-দিনে আমার কপালেও ছাপ মেরে যেত না?—এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, বাবা তোমরা সবাই বলো, পৃথিবী সম্পদে সভ্যতায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই বাঙলাদেশে আমরাই তাদের অগ্রদূত,—নিমাই ভট্‌চায্যি তাই আজ আমাকে দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু এত বড় তামাশা কি আর আছে? গাঙ্গুলী-মশায়ের পীড়িত উদ্‌ভ্রান্ত আত্মার কল্যাণ হোক, কিন্তু যে সভ্যতায় দরিদ্রের মুখের গ্রাস, দুঃখীর জীবন ধনীর মুঠোর মধ্যে এমন ভয়ানক নিরুপায় করে এনে দেয়, তাকে কেউ রক্ষে করতে পারে না, সে কি-রকম সভ্যতা? আর তাই যদি হয় বাবা, এ সভ্যতায় আমার কাজ নেই। এই নির্দয় প্রহসন থেকে আমার মুক্তি চাই।

পিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কন্যার বেদনাতুর হৃদয়ের ক্ষুব্ধ উত্তেজনাকে শান্ত করিতে নিজেও শান্তকণ্ঠে কহিলেন—উপায় কি মা? দুঃখী-দরিদ্র চিরদিনই

ধনীর হাতের মধ্যে থাকে আলো, এমনিই সংসারের বিধান।

আলেখ্য শান্ত হইতে পারিল না, কহিল—না বাবা, এ বিধান যতই পুরানো, যতই কেননা চিরদিনের হউক, কিছুতেই ভাল না। জগতে ধনী ও দরিদ্র যদি থাকে ত থাক, কিন্তু এমন একান্তভাবে, এমন উপায়হীন কঠিন বাঁধনে কেউ কারও হাতের মধ্যে থাকা কোনমতেই মঙ্গলের বিধান হতে পারে না বাবা। ধনীরও না, দরিদ্রেরও না। এতটুকু মুঠোর চাপে যার মানুষ মারা পড়ে, অন্ততঃ, সে কিছুতেই বলতে পারে না। লোকে বলে, তার মাথা ঠিক ছিল না. তবু ত আমি এ কথাটাও জীবনে ভুলতে পারব না যে, তার পাঁচ বৎসরের আয়ু আমার ঐ একটা আয়নার মধ্যেই রয়ে গেছে। আরও কত লোকের মরণ-ইতিহাস যে আমার জুতো-জামার পরতে পরতে লেখা আছে, তাই বা কে জানে বাবা?

তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ পিতা ভয় পাইলেন; জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—পাগল আর কি! তা হলে ত সংসারে আর বাস করা চলে না আলো!

আলেখ্য জবাব দিল—তোমার কপালে ত বুড়োমানুষের রক্তের দাগ নেই বাবা।

পিতা কহিলেন—তোমার যত দোষ এঁরা তোমাকে বুঝিয়ে গেছেন মা, তার সবই সত্য নয়।

মেয়ে বলিল – আমি কি এর দাগ মুছতে পারব না বাবা?

বাবা বলিলেন—কেন পারবে না? তোমার কোন কাজেই ত আমি বাধা দিইনে মা।

রূপার রেকাবিতে একখানা হলদে রঙের খাম রাখিয়া বেহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। আলেখ্য খুলিয়া দেখিয়া পিতার হাতে দিয়া কহিল—ইন্দুকে নিয়ে কমল-কিরণ আসছেন।

কখন?

আজই সন্ধ্যার ট্রেনে।—এই বলিয়া আলেখ্য অন্যত্র চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে রে-সাহেব সেইখানে বসিয়াই নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনার সুতীব্র আঘাতে আলেখ্যের মনের মধ্যে যে ঝড় বহিতে শুরু করিয়াছে, তাহার গুরুত্ব কত এবং কতখানি ব্যাপক হইয়া জীবনকে তাহার অধিকার করিবে, এবং সমাজের মধ্যে ইহার ফলাফল কি, তাহাই উদ্বিগ্নচিত্তে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। যে ক্ষুদ্রায়তন সংকীর্ণ সমাজের মাঝে তাঁহার জীবনের দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল, তাহার প্রতি তাঁহার মমতা ও প্রীতি ধীরে ধীরে যে কমিয়া আসিতেছিল, একথা তিনি মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত না করিলেও নেতৃস্থানীয়গণের অগোচর ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের সম্বন্ধে এমন কথা কখনও তিনি কল্পনাও করিতেন না যে, যে সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে দিয়া সে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই অশ্রদ্ধা করিয়া সে কিছুতেই সুখী হইতে পারে না! এ আশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাহার কোনমতেই

চলিতে পারে না। এ বিশ্বাস তাঁহার দৃঢ় ছিল। ঘোষ সাহেব ও তাঁহার পারিবারিক চালচলনের প্রতি মনে মনে তাঁহার অতিশয় বিরাগ ছিল, কন্যার প্রতি ইহাদের দৃষ্টি আছে, এ কথা মনে করিয়াও মনের মধ্যে তাঁহার জ্বালা করিত, কিন্তু আজ তাহাদের আসার সংবাদে তিনি শুধু খুশী ন'ন, যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। ইন্দুমতী আলেখ্যের ছেলেবেলার বন্ধু এবং কমলকিরণও যে অবাঞ্ছিত অতিথি নয়, এ ধারণা তাঁহার ছিল। সম্প্রতি যে অঘটন ঘটিয়া গেছে, যাহাকে ফিরাইবার আর পথ নাই, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সমস্ত গ্রামের মধ্যে যে গ্লানি ও শোকোচ্ছ্বাসের তুফান ছুটিয়াছে, তাহারই ধাক্কা হইতে মেয়েটা যদি কিছুদিনের জন্যও নিষ্কৃতি পায়, ব্যাপারটাকে যদি দুটা দিনও ভুলিয়া থাকিতে পারে, এই মনে করিয়া সাহেব আগে হইতেই তাঁহার অতিথিদের অন্তরের মধ্যে সংবর্ধনা করিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে ভগিনীকে লইয়া কমলকিরণ আলেখ্যের পৈতৃক বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব নিজে থাকিয়া তাঁহাদের আদর করিয়া গ্রহণ করিলেন। আলেখ্য পাশে দাঁড়াইয়া সভ্য-সমাজের সর্বপ্রকারে অনুমোদিত অভ্যর্থনার কোথাও কোন ত্রুটি করিল না, কিন্তু তবুও তাহার মুখের চেহারায় আগন্তুক এই দুটি ভাই-বোনে কি যে সাহস দেখিতে পাইল, তাহাদের মন যেন একেবারে দমিয়া গেল।

বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই, রাত্রে ডিনারের আয়োজন একটু বিশেষ করিয়াই হইল। মুসলমান বাবুর্চির এত দিন প্রায় একরকম ঘুমাইয়া কাটিতেছিল, সে তাহার যথাসাধ্য করিল। ফুলের সময় নয়, তথাপি টেবুলে তাহার অপ্রতুল হইল না, প্রয়োজনের অনেক বেশী আলো জ্বলিল, সদ্য-রং-করা দেওয়ালের গায়ে ও সাহেব-বাড়ির দীর্ঘায়তন মুকুরে তাহার সমস্ত রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া ঘরটাকে যেন দিনের বেলা করিয়া দিল। রূপার ছুরি-কাঁটা, রূপার চামচ, রৌপোর বাতিদান, দুর্মূল্য পাত্রে দুর্মূল্য ভোজ্য ও পেয়, তুষারশুভ্র চাদরের উপরে সে যেন কেবল চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার। সজ্জায় ও শোভায়, পোশাক ও পরিচ্ছদে, হাসি ও গল্পে, বিলাস ও ব্যসনে মনে হইল, যেন একটা দুঃখ ও পীড়নের ভূত সহসা গয়ায় পিণ্ডলাভ করিয়া এই একটা বেলার মধ্যেই বাড়িটাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

ডিনার অগ্রসর হইয়া চলিল। অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত রে সাহেবের উৎসাহে, তাঁহার ছুরি ও কাঁটার ক্ষিপ্র পরিচালনে হঠাৎ যেন তাঁহাকে চেনাই যায় না। ঠিক এমনই সময়ে বেহারা আসিয়া তাঁহার হাতে একটুকরা কাগজ দিল। চশমার অভাবে তিনি হাত বাড়াইয়া কাগজটুকু ইন্দুর হাতে দিয়া বলিলেন—দেখ ত মা কে?

ইন্দু পড়িয়া কহিল, অমরনাথ।

সাহেব অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া বলিলেন—ফিরেছে সে? আমি কতই না ভাবছিলাম। - কমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সে আমাদের বাড়ির ছেলের মত। ঝড়ু, তাকে এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

আলেখ্য শঙ্কিত হইয়া কহিল—এই ঘরে?

সাহেবের সেদিকে চোখ ছিল না, বলিলেন—হ'লই বা। কমল, এমন একটি ছেলে কিন্তু বাবা, আর কখনও চোখে দেখিনি। আমাদের মধ্যে ত ছেড়েই দাও, হয়ত বিলেতেও কখনও দেখতে পাওনি। যা না ঝড়ু, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

ঝড়ু চলিয়া গেল এবং অনতিকাল পরেই লোকটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া উপস্থিত হইল। তাহার খালি পা, মুখ অতিশয় শুষ্ক ও মলিন, মনে হয় যেন সমস্তদিন তাহার জলবিন্দুটুকুও জুটে নাই, মাথার একদিকে ব্যান্ডেজ করা—রক্তের দাগ তখনও কালো হইয়া আছে সাহেব চমকিয়া উঠিলেন—ব্যাপার কি অমরনাথ—এ কি কাণ্ড ?

আগন্তুক চারিদিকে নিঃশব্দে বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ভোজনে ক্ষণকালের জন্য তাঁহাদের বাধা পড়িল বটে, কিন্তু দরিদ্র মূর্খ, ক্ষুধিত, বঞ্চিত এই পল্লীর মাঝখানে এই আহারের আয়োজনে তাহার কাছে যেন বিড়ম্বনা একেবারে মূর্তিমান হইয়া দেখা দিল। ('মাসিক বসুমতী', ! বৈশাখ ১৩০১)।

ছয়

অত্যন্ত কৌতূহলে ভয় ও ভাবনা মিশিয়া সাহেবের আহারের রুচি ও প্রবৃত্তি মুহূর্তে তিরোহিত হইয়া গেল। হাতের কাঁটা ও ছুরি ফেলিয়া দিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—এ-সব কি করে হ'ল অমরনাথ ?

অমরনাথ কহিল—আপনি কোন্‌টা জানতে চাইছেন ?

সাহেব ক্ষুন্ন হইয়া বলিলেন—তুমি কি রাগ করলে বাবা ? আমি সমস্ত ব্যাপারটাই জানতে চাইচি। কিন্তু সে না হয় পরে হবে, তোমাকে আঘাত করলে কে ? পুলিশ ?

অমরনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না, গ্রামের লোকই আঘাত করেছে, কিন্তু এই যে ঠিক সত্য, তাও নয় রায়-মশায়।

তা হলে সত্যটা কি ?

অমরনাথ বলিল—দেখুন, এর মধ্যে সত্য শুধু এইটুকু যে, আমার ফোঁটা-কয়েক রক্তপাত হয়েছে।

সাহেব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু এ কাজ আমার হাটের মধ্যেই ত হ'ল।

অমরনাথ নীরবে সায় দিয়া জানাইল—তাই বটে।

এখনও তোমার খাওয়া-দাওয়া বোধ করি কিছুই হয়নি ?

না।

সাহেব বলিলেন—তোমার বাড়ি ত খুব কাছে নয়,—কিন্তু এ বাড়িতেও উদ্যোগ আয়োজন বোধ হয় কিছুই হতে পারবে না এখানে তুমি কিছুই খাবে না, না ?

অমরনাথ একটুখানি হাসিয়া বলিল—না।

সারাদিনটা তা হলে উপবাসেই কাটলো ?

অমরনাথ ইহার উত্তর কিছুই দিল না, কিন্তু বুঝা গেল, সমস্ত দিনটা তাহার উপবাসেই কাটিয়াছে। সাহেব নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, তা হলে আর বিলম্ব করো না, বাবা, বাড়ি যাও।—এই বলিয়া তিনি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—চল, তোমাকে একটুখানি এগিয়ে দিয়ে আসি।

অমরনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কহিল—সে কি কথা? আমাকে আবার এগিয়ে দেবেন কি! তা ছাড়া, খাওয়া আপনার শেষ হয়নি,—উঠতে আপনি কিছুতেই পারবেন না, রায়-মশায়।

সাহেব জিদ করিলেন না, কোন বিষয়েই জিদ করা তাঁহার স্বভাব নয়। শুধু যাইবার সময় ধীরে ধীরে বলিলেন—যেজন্যে তুমি এত রাত্রে এসেছিলে, তার আভাসমাত্র পাওয়া ভিন্ন আর কিছুই জানতে পারলাম না। কিন্তু কাল যখন হোক একবার এসো, অমরনাথ।

অমরনাথ স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলে সাহেব কহিলেন—এ অঞ্চলে অমরের গায়ে কেউ আঘাত করতে সাহস করবে, এ কথা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। ভিতরে ভিতরে ব্যাপারটা হয়ত অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তা ছাড়া আমারই হাটের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটলো!

ভাবে বুঝা গেল, রে-সাহেবের আহারে আর প্রবৃত্তি নাই, আলেখ্য বিমর্ষ অধোমুখে খাদ্যবস্তু লইয়া খাওয়ার ভান করিতে লাগিল মাত্র। মিনিট দশ-পনর পূর্বেও ডিনারের যে উৎসব পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছিল, ঐ অপরিচিত লোকটার আসা ও যাওয়ার মধ্যেই সমস্ত যেন নিরুৎসাহে নিবিয়া গেল। তাহার কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত এবং প্রাঞ্জল, এমনকি, হিন্দুত্বের গোঁড়ামির দিক দিয়া একপ্রকার সরল রূঢ়তাও আছে, অনাড়ম্বর বেশভূষা একটু বিশেষ করিয়াই চোখে পড়ে, সম্প্রতি একটা মারামারি করিয়া আসিয়াছে এবং তাহা পুলিশের বিরুদ্ধে হইলে এক ধরনের বীরত্বও আছে। কিন্তু রে-সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার হেতু ইন্দু বা তাহার দাদা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিতে পারিয়া ইন্দুই প্রথমে প্রশ্ন করিল—ইনি কে, আলো?

রে-সাহেব ইহার জবাব দিলেন; কহিলেন—ইনি একজন নবীন অধ্যাপক, টোলে অধ্যাপনা করেন, গুটিকয়েক বিদেশী ছাত্রও আছে, কিন্তু অধ্যাপনার কাজ এখন বিরল হয়ে এলেও এদেশে আরও অধ্যাপক আছেন, সুতরাং এ তাঁর বিশেষত্ব নয়; অধুনা দেশের কাজে লেগে গেছেন, কিন্তু একেও অসাধারণ বলিনে। অসাধারণত্ব যে এঁর ঠিক কোথায় তাও আমি জানিনে, কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি নিঃসংশয়ে করে যেতে পারি, ইন্দু, অমরনাথ বেঁচে থাকলে একদিন এঁকে মানুষ বলেই দেশের মানুষকে স্বীকার করতে হবে।

কাহারও ভবিষ্যদ্বাণীর উপরে তর্ক করা চলে না, বিশেষতঃ তিনি গুরুজনস্থানীয় হইলে নীরব হইতেই হয়। ইন্দু চুপ করিয়া রহিল; কমলাকিরণ প্রশ্ন করিল—

মিস্টার রে, এই লোকটিই কি আপনার প্রজাদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিলেন?

সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

আপনার হাটের মধ্যে ইনি গিয়েছিলেন কেন? বোধ করি এই উদ্দেশ্যেই?

সাহেব প্রশ্ন শুনিয়া হাসিলেন; কহিলেন—বিলাতী কাপড়ের বিক্রি বন্ধ করতে।

কমল কহিল—অর্থাৎ নন্-কো-অপারেশনের ভিলেজ পান্ডা। দোকানদারের দল বিরক্ত হয়ে তাই নবীন অধ্যাপকের রক্তপাত করেছে, এই না মিস্টার রে?

সাহেব সায় দিয়া বলিলেন—খুব সম্ভব তাই।

কমল কহিল—এবং তারা খবর দিয়ে পুলিশ এনে হাজির রেখেছিল?

আলেখ্য এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সে-ই ইহার উত্তর দিল, সলজ্জ মৃদুকন্ঠে বলিল—আমিই একদিন পুলিশের সাহায্য চেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি লিখে দিয়েছিলাম।

কমল কহিল—ঠিক কাজ করেছিলেন, এখন শুধু এইটুকু বাকী আছে—লোকটিকে প্রসিকিউট করা। অন্ততঃ মার্কেট আমার হলে আমি তাই করতাম।

সাহেব কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেদিনের হরতালের কথা মনে পড়িল, যেদিন রাগ করিয়া রাস্তার লোক কমলের পিতার গাড়ির কাচ ভাঙিয়া দিয়াছিল। এ অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন নাই, অনেককেই কারাগারে যাইতে হইয়াছিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে কহিলেন—আমার মনে হয়, তাতে লাভের চেয়ে লোকসানের মাত্রাই বেশী হ'ত কমল। হয়ত কাল কিংবা পরশু আমাদের যাকে হোক হাটের একটা ব্যবস্থা করতে যেতেই হবে, সহজে মীমাংসা হবে না,—অথচ পুলিশের লোক মধ্যে না থাকলে মনে হয়, এর প্রয়োজনই হ'ত না।

ইন্দু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খবর দেওয়া কি আপনার মত নিয়ে হয়নি?

সাহেব কন্যার অধোমুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন—আমার মতামতের আবশ্যকই ছিল না, ইন্দু। তোমরা একটা কথা জান না যে, সাংসারিক সকল ব্যাপার থেকেই আমি অবসর নিয়েছি, বিষয় এখন আলোর, বিলি-ব্যবস্থা যা-ই করতে হোক, তাকেই করতে হবে। ভুল যদি হয়েও থাকে, তাকেই এর সংশোধনের ভার নিতে হবে।

কমল চকিত হইয়া বলিল—আপনি জীবিত থাকতে সে কি করে হতে পারে?

সাহেব হাসিমুখে কহিলেন—তা হলে আমি বেঁচে নেই, এই কথাই মনে করে নিতে হবে।

কমল বলিল—মনে করা কঠিন এবং আলেখ্যের মত অনভিজ্ঞের এ ভার বহন করা আরও বেশী কঠিন।

ইন্দু বলিল—বিস্তর ভুলচুক হবে।

সাহেব কহিলেন – ভুলচুকের দণ্ড আছে। হলে নিতে হবে।

ইন্দু কহিল—তা ছাড়া বিপদ বাধাবার শত্রু যখন আশেপাশে রয়েছে।

সাহেব কহিলেন – আশেপাশে শত্রুই শুধু থাকে না ইন্দু, মিত্রও থাকে। তারা বিপদ-উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দেবে। সে যার থাকে না, সংসারে সে পরাভূত হয়। একাকী বাপ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, মা।

ইন্দু তাহা স্বীকার করিল এবং তাহার দাদা ইহাকে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মনে করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

পরদিন সকালেই রে-সাহেবের অনুজ্ঞামত অমরনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাতরাশ সেইমাত্র শেষ হইয়াছে, বসিবার ঘরে সকলে উপবেশন করিলে সাহেব যে কথাটা সর্বপ্রথম জানিতে চাহিলেন, তাহা লোকটার নাম, যে হাটের মধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

অমরনাথের মুখের ভাবে বিস্ময় প্রকাশ পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

সাহেব বলিলেন—এর একটা প্রতিকার হওয়া চাই।

অমরনাথ কহিল—কিন্তু আপনি ত আর কিছুর মধ্যেই নেই, রায়-মশায়।

সাহেব বলিলেন—আমি নেই সত্য, কিন্তু যিনি আছেন, তাঁর ত এ বিষয়ে কর্তব্য আছে।

পিতার ইঙ্গিত আলেখ্য বুঝিল। নয়ন গাঙ্গুলির আত্মহত্যার পর হইতে সে গ্রামের লোকজনের সম্মুখে সহজে আসিতে চাহিত না, আসিয়া পড়িলেও নীরব হইয়াই থাকিত। তাহার সর্বদাই মনে হইত, ইহারা এই দুর্ঘটনায় তাহাকেই সর্বতোভাবে দায়ী করিয়া রাখিয়াছে এবং অন্তরালে যে-সকল কঠিন ও কটু বাক্য তাহারা উচ্চারণ করে, কল্পনায় সমস্ত সে যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইত; এবং ইহার লজ্জা তাহাকে যে কতদূর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা শুধু সে নিজেই অনুভব করিত।

আলেখ্য পিতার প্রশ্নের সূত্র ধরিয়া বলিল, বেশ, আমিই আপনাকে তাদের নাম জানাতে অনুরোধ করছি।—এই বলিয়া আজ সে অনেকদিনের পরে মুখ তুলিয়া চাহিল। সেই শান্ত, বিষণ্ণ মুখের প্রতি অমরনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাতিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল—দেখুন, তারা আপনার প্রজা, কেবলমাত্র কৌতূহলবশেই যদি তাদের পরিচয় জানতে চেয়ে থাকেন, এ কৌতূহল আপনাকে দমন করতে হবে।

আলেখ্য কহিল—তারা আমার প্রজা না হলে, আপনাকে আমি জিজ্ঞাসাও করতাম না। জমিদারের একটা কর্তব্য আছে, এই অন্যায়ের আমি প্রতিকার করতে চাই।

অমরনাথ বলিল—আপনি তাদের শাস্তি দিতে চান, কিন্তু তাতে প্রতিকার হবে না।

আলেখ্য কহিল—অন্যায়ের প্রতিকার ত শুধু শাস্তি দিয়েই হয়।

অমরনাথ মুচকিয়া হাসিয়া কহিল—এই নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে

চাইনে এবং জমিদার কি করে প্রজার শাসন করে থাকেন, তাও আমি জানিনে। কিন্ত এ কথা নিশ্চয় জানি অন্যায় এবং অজ্ঞতা এক জিনিস নয় এবং শাস্তি দিয়েও এর কিছু প্রতিকার হবে না।

একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া অমরনাথ পুনশ্চ কহিল, আমাকে তারা আঘাত করেছে সত্য, কিন্তু সেই আঘাতের শাস্তি দিতে যাওয়ার মত পণ্ডশ্রম আর নেই। মার খাওয়াটাই যদি আমার কাছে বড় হ'ত, সেখানে আমি যেতাম না। আমার আঘাতে যথার্থই যদি আপনি বিচলিত হয়ে থাকেন ত এইটুকু আমার মঞ্জুর করুন, এই নিয়ে আমার প্রতি তাদের আর বিরূপ করে তুলবেন না।—এই বলিয়া অমরনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। ('মাসিক বসুমতী', আষাঢ় ১৩৩১)

সাত

রে-সাহেব কমলকিরণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—এ সম্বন্ধে তোমার কি মত হে?

কমলের চোখের দৃষ্টি চোখের পলকে ইন্দু ও আলেখ্যের মুখের উপর দিয়া গিয়া সাহেবের প্রতি স্থির হইল।

অমরনাথ গমনোদ্যত হইয়াও তখনও দাঁড়াইয়া ছিল; নিজের পূর্ব-কথার অনুবৃত্তিস্বরূপে বিনীতকণ্ঠে কহিল—সম্পত্তি আপনাদের, এর ভালমন্দ আপনাদের-ই নিরূপণ করতে হবে, কিন্তু যাই করুন, আমাকে উপলক্ষ্য করে যেন কিছুই করবেন না, এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

সাহেব ব্যস্ত হইয়া বলিতে গেলেন—না না, তুমি যখন তা চাও না, কি বল ইন্দু? কি বল আলো? এই বলিয়া তিনি উপস্থিত সকলকে, বিশেষ করিয়া যেন নিজেকেই নিজে আবেদন করিলেন।

ইন্দু ঘাড় নাড়িল, কমলকিরণও বোধ হয় যেন সায় দিতে যাইতেছিল এবং আলেখ্য ত গাঙ্গুলী বৃদ্ধের আত্মঘাতের ভারে চাপা পড়িয়াই ছিল—স্বাধীন মতামত দিবে কি, প্রকাশ্যে মুখ দেখাইতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ উত্তর বাহির হইল তাহারই মুখ দিয়া। এই নবীন অধ্যাপকের সহিত প্রথম পরিচয়ের দিনে তাহাদের সদ্ভাব জন্মে নাই; তাহার পরে যতবারই উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে-অসদ্ভাব বৃদ্ধির দিকেই বরাবর গিয়াছে। গাঙ্গুলীর মৃত্যুর ব্যাপারে সেদিন রাত্রে অমরনাথের কাছে সে সহানুভূতি পাইয়াছিল, বিরুদ্ধতা সে করে নাই, তথাপি আলেখ্যের মনের লজ্জা তাহাতে গোপনে বাড়িয়াছিল বৈ লেশমাত্র কমে নাই; এবং ইহারই সম্মুখে আপনাকে যেন সে সামান্য; একাকী ও সর্বাপেক্ষা বেশী অপরাধী না ভাবিয়া পারিত না। আজ এইসকল পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে বসিয়া অকস্মাৎ আপনাকে যেন সে ফিরিয়া পাইল। বেশ সহজভাবে মুখ তুলিয়া

স্বাভাবিক শান্তস্বরে বলিল—হাঙ্গামা বাধালেন আপনি, আর বিপদ ভোগ করব শুধু আমরা ? এ কি-রকম প্রস্তাব হ'ল আপনার ?

কমলকিরণ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল—একজ্যাক্টলি ! ঠিক তাই আমি বলি।

অমরনাথ পা বাড়াইয়াছিল, থমকিয়া দাঁড়াইল।

আলেখ্য কহিল—আপনার বাড়ি এখানে, আপনি গেছেন আর একটা জায়গায় হাটের মধ্যে মেড্‌ল করতে। জানিনে, তাতে দেশের ভাল হবে কি মন্দ হবে। ধরে নিলাম, ভালই হবে, কিন্তু সম্পত্তি আমার, তার ভালমন্দতে আমারও একটু শেয়ার আছে। অথচ, আমার অভিমতের কোন মূল্য আপনার কাছে নেই, এখানে আমাকেই বলতে এসেছেন, আপনাকে যেন না উপলক্ষ্য সৃষ্টি করি। এ অনুরোধ আপনার নিতান্ত অসঙ্গত।

তাহার মুখের এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত মন্তব্য শুনিয়া শুধু কেবল তাহার শ্রোতাই নয়, উপস্থিত সকলেই যেন অবাক্ হইয়া গেল। সবচেয়ে বেশী হইলেন রে-সাহেব নিজে।

বিস্মিত অমরনাথ আলেখ্যের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, সুসঙ্গত উত্তর সহসা তাহার মুখে যোগাইল না।

সাহেব কি একটা বলিতে চাহিয়া শুধু বলিলেন—না না, ঠিক তা নয়—কিন্তু কি জান, অমরনাথ বোধ করি—

আলেখ্য হাসিয়া কহিল - কি বোধ কর বাবা ?

ইন্দু এবং কমলকিরণ দুইজনেই মুখ টিপিয়া হাসিল।

অমরনাথ আপনাকে লাঞ্ছিত বোধ করিয়া কহিল,—বেশ, আমার অনুরোধ আপনি রাখবেন না।

আলেখ্য কহিল—অনুরোধ রাখব না, এ আমি বলিনি। কিন্তু ন্যায়-অন্যায় যাই হোক, কেবলমাত্র তারা আপনার প্রতি আর বেশী অপ্রসন্ন না হয়, এই অসঙ্গত অনুরোধ আমি রাখব না বলেছি।

অমরনাথ কহিল—কোনরূপ অনুরোধ করার সঙ্কল্প নিয়ে আপনাদের কাছে আমি আসিনি। আমাকে তারা আঘাত করেছে, কিন্তু এই নিয়ে তাদের শাস্তি দিতে যাবার মত নিরর্থক কাজ আর নেই, এই কথাই শুধু আমি জানাতে এসেছিলাম।

আলেখ্য বলিল—একজন তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে যা নিরর্থক, জমিদার এবং প্রজার পক্ষে তা নিরর্থক না-ও হতে পারে। অন্ততঃ, সে স্থির করবার ভার আমাদের উপরেই থাক।

কমলকিরণ কহিল—ঠিক তাই। আমাদের রেস্‌পন্‌সিবিলিটি আমরা নিজেদের হাতেই রাখবো। থার্ড পারসনের মাঝখানে আসবার একেবারেই প্রয়োজন দেখিনি। মিস্টার রে, আপনি কি বলেন ?

সাহেব সকলের মুখের দিকেই চাহিলেন। এই কালই ত আলেখ্য বাঙলাদেশের

দরিদ্র প্রজাদের দুঃখে বিগলিত হইয়া কত কথাই বলিয়াছিল এবং অমরনাথ যে তাহাদেরই কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, এ কথাও ত সে জানে। আঘাত খাইয়া যে প্রতিঘাত করিতে চাহে না, তাহাদেরই কল্যাণের জন্য যে নিঃশব্দে সমস্ত সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সহিষ্ণুতায় হঠাৎ কেন যে আর একজন এতখানি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন—এ ত অতিশয় সাধারণ আলোচনা কমল, এর ভিতর হিটু কিসের জন্য উঠছে, আলো? বেশ ত, কি করা উচিত অনুচিত, শান্ত হয়েই তোমরা তার বিচার কর না, অমরনাথ! আর এখনই বা কেন? কালও হতে পারে।

অমরনাথ কহিল—রায়-মশায়, তৃতীয় ব্যক্তির মাঝখানে, আসাটা কেউ পছন্দ করে না। সংসারে জমিদার ও প্রজা ছাড়া যদি না আর কিছু থাকতো ত কোন কথাই ছিল না, কিন্তু বিপদ এই যে, তৃতীয় ব্যক্তি বলে একটা বস্তু সংসারে আছে এবং পছন্দ না করলেও ও বস্তুর অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত করা যাবে না। এঁরা এত বোঝেন, এই তুচ্ছ কথাটাও যদি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতেন!—এই বলিয়া সে শুষ্ক হাস্য করিবার একটুখানি প্রয়াস করিলেও কথাগুলো যে পরিহাস নয়, বিদ্রূপ, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না; এবং ইহার মধ্যে খোঁচা যাহা ছিল, তাহা বিন্ধ করিতেও ত্রুটি করিল না।

আলেখ্য কঠিন হইয়া বলিল—ইংরাজীতে 'বিজি-বডি' বলে একটা শব্দ আছে, মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, সংসারে সর্বত্রই এই লোকগুলোর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। না হলে পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষার জন্য এমন ছুটোছুটি করে বাবাকেও আসতে হ'ত না, আমাকেও না। দেখুন অমরনাথবাবু, অনাহূত অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আমি লজ্জাবোধ করি, কিন্তু অপরের যদি এ লজ্জাবোধ না থাকে ত অপ্রিয় হলেও কর্তব্য আমাকে করতেই হবে।

কন্যার কথা শুনিয়া সাহেবের ক্ষোভের সীমা রহিল না। হৃদয়ে যথার্থ বেদনা বোধ করিয়া কহিলেন—কাজের চেয়ে তোমাদের বাক্যগুলো যে ঢের বেশী কটু হচ্ছে, মা! বিশেষ করে যখন অমরনাথ আমাদের বাড়িতে এসেছেন।

মেয়ে কহিল—অমরনাথবাবু সম্ভ্রান্ত লোক, তথাপি বলার যদি কিছু আমার থাকে ত আমার নিজের বাড়ি ছাড়া আর কোথায় বলতে পারি বাবা? এ অপরাধ নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করবেন। আর অপরাধ যদি হয়েই থাকে, তাকে সম্পূর্ণ করে দেওয়াই ভাল। আমাদের শিক্ষা-সংস্কার, আমাদের সংসার-যাত্রার বিধি-ব্যবস্থা অমরনাথবাবুর ধারণার সঙ্গে এক নয় বলেই যে আমাদের প্রজাদের আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে হবে, এ আমি কোনমতেই সঙ্গত মনে করিনে।

অমরনাথ উত্তর দিল—কাজ যদি আমাকে করতেই হয়, নিজের ধারণা নিয়েই করতে পারি। নইলে আপনার ধারণা অনুমান করে বেড়াবার মত সময় বা কল্পনা

আমার নেই। একে যদি উত্তেজিত করা মনে করেন, উত্তেজিত করা ছাড়া আমার উপায় কি আছে ?

আলেখ্য কহিল—তা হলে আত্মরক্ষা করা ছাড়া আমারই বা কি উপায় আছে, আপনি বলে দিতে পারেন ?

রে-সাহেব দুই হাত উঁচু করিয়া ধরিয়া বাধা দিয়া বলিলেন - না, অমরনাথ, তুমি কিছুতেই এর জবাব দিতে পারবে না, এ আমি কোনমতেই হতে দিতে পারব না।—এই বলিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তাহাকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেলেন। সিঁড়ির কাছে আসিয়া বলিলেন—অমরনাথ, আজ আমার বিস্ময়ের অবধি নেই।

অমরনাথ এ কথার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল—কেন ?

রে-সাহেব বলিলেন—কেবল বিস্ময় নয়, বাবা, আমার দুঃখেরও আজ সীমা নেই।

বারান্দার একধারে ঘষা-কাচের একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, সেই অস্পষ্ট আলোকে অমরনাথ বক্তার মুখের 'পরে অকৃত্রিম বেদনার ছায়া দেখিতে পাইয়া বলিল—দুঃখ কি জন্যে রায়-মশায় ? ওঁদের শিক্ষা ও সংস্কার যে আমাদের ধারণার সঙ্গে কিছুতেই মিলতে পারে না, এই ত স্বাভাবিক। তবে, আমার হয়ত এত কথা না বলাই শোভন ছিল, কিন্তু আপনার সমস্ত জমিদারির তিনিই না কি সত্যকার কর্ত্রী, তাই বোধ হয়, চুপ করে থাকতে পারলাম না। আপনার কাছে প্রগল্‌ভতা-প্রকাশের জন্য আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু আপনি নিজে যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন ত আমার তরফ থেকে দুঃখ করবার আর কিছুই নেই।

সাহেব বলিলেন—ক্ষমার কথাই ব'লো না অমরনাথ,—তোমাকে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে আমার কাছে তোমার অপরাধ বলে কিছু হতেই পারে না। দোষ অপরাধ নয় বাবা, আজ তোমাদের মস্ত বড় ভুল হয়ে গেল।

ভুল কিসের ?

সাহেব বলিলেন—ভুল এই যে, তুমি যা বলেছো, সে-ও তোমার সত্য বলা নয়, এবং আলেখ্য যা-কিছু বলেছে, সমস্তই তার অপরের। সে জবাব তোমার কথার নয়।

সাহেবের কথা অমরনাথ বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবার তাহার ইচ্ছাও ছিল না, সময়ও ছিল না। যাইবার জন্য নমস্কার করিয়া শুধু কহিল—কাজ আমার ঢের শক্ত হয়ে গেল, কিন্তু উপায় কি ? প্রথম জীবনে যে ব্রত গ্রহণ করেছি, সারা জীবন ধরে তার উদ্‌যাপন আমাকে করতেই হবে।—এই বলিয়া সে অন্ধকার প্রাঙ্গণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সাহেব ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেই আলেখ্য কহিল—বাবা, তুমি যতদিন বেঁচে আছ, জমিদারির সত্যিকার মালিক তুমি, আমি নয়। কোনদিন আমার হবে কি না, সে-ও ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু, আমাকে দিয়ে যদি বাস্তবিক শাসন করিয়ে নিতে চাও, আমি আমার বুদ্ধি-বিদ্যের মতই করতে পারি। কিন্তু, একবার এ-দিক, একবার

ও-দিক যদি হয় ত, বরঞ্চ যা ছিল তাই থাক্, আগে যেরকম চলে আসছিল, তেমনই চলতে থাকুক।

তাহার পিতা জবাব দিলেন না, চুপ করিয়া আসিয়া তাঁহার চৌকিতে বসিলেন। এই নীরবতার তাৎপর্য আর কেউ বুঝিল না, বুঝিল শুধু আলেখ্য, কিন্তু বুঝিয়াও সে আপনাকে দমন করিতে পারিল না, কহিল—বাবা, তোমার কথায় তোমার আচরণে অনেকে যারপরনাই প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। এ তুমি বুঝতে না পারো, কিন্তু আমি একেবারে হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

সাহেব এ অভিযোগের কোন উত্তর দিলেন না, তেমনই মৌন হইয়াই বসিয়া রহিলেন। আগন্তুক অতিথিদ্বয়ও নীরবে রহিলেন ; কারণ, এখন বোধ হয়, কন্যা ও পিতার মাঝখানে সহসা একটা কথা যোগ করিয়া আতিথ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে তাঁহাদের বাধিল, কিন্তু তাঁহাদেরই মুখের ওপরে নিঃশব্দ অনুমোদনের সুস্পষ্ট আভাস দেখিতে পাইয়া আলেখ্যের উত্তেজনা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল, কহিল—দেশে কি যে একটা হাওয়া এসেছে বাবা, কতকগুলি ভদ্রসন্তান হঠাৎ কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে একেবারে নিঃস্বার্থ পরোপকারে লেগে গেছেন, নিজেরা বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট হয়ে গেছেন, স্থির করেছেন, এক গালে চড় খেলে আর এক গাল পেতে দেবেন। গাল তাদের এবং সে সহিষ্ণুতা থাকে, পেতে দিন, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু সেই জোরে ত এ জোর প্রতিপন্ন হয় না বাবা যে, অপরের সম্পত্তি নিয়ে তারা যা খুশি তাই করতে পারেন। কেমন করে যেন তাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, যাদের কিছু আছে, তাদের ক্ষতি করতে পারলেই যাদের কিছু নেই তাদের পরম উপকার হয়ে যায়।

কমলকিরণ বোধ করি আর থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন—এই যেমন বাবার গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীন ভেঙে দেওয়া।

আলেখ্য কহিল—হাঁ, কিন্তু এগুলো সহ্য করে যাওয়াই বোধ হয় কর্তব্য নয়।

কমলকিরণ কহিলেন—বাবারও ঠিক তাই মত।

উৎসাহ পাইয়া আলেখ্যের কণ্ঠস্বর অধিকতর তীব্র হইয়া উঠিল। কহিল—কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে, বাবার সে মত নয়। কিন্তু তুমি ত জান বাবা, এতকাল জমিদারির তুমি কোন খবর রাখনি। সমস্ত সিস্টেমটা একেবারে মরচে ধরে গেছে। সেইসব পরিষ্কার করতে গিয়ে যদি কেউ আত্মহত্যা করে বসে, সে কি আমার অপরাধ ? কিন্তু সমস্ত আমার ঘাড়ে তুলে দিয়ে যারা হৈহৈ ক'রে বেড়াচ্ছে, আমি কোথাও মুখ দেখাতে পারিনে—না বাবা, হয় তুমি সত্যিই আমাকে ভার দাও, না হয়, যা ছিল তাই থাক, আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখানে আবার ফিরে যাই।

এ অভিযোগ যে কাহার উপর, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। সাহেব বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিলেন এবং ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন—কিন্তু অমরনাথ ত এ প্রকৃতির লোক নয় আলো ! বরঞ্চ, আমি যেন তার কথার ভাবে বুঝলাম—

তাঁহার কথাটা শেষ হইল না, কমলকিরণ বলিয়া উঠিলেন—রাদার আমার মনে হয় মিস্টার রে, তিনিই জ্যাণ্ট দি ম্যান্—এইসব পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ভট্চাষ্যি বামুনগুলো—তোমার কি মনে হয় ইন্দু ? ঠিক না—এই বলিয়া তিনি আলেখ্যের মুখের প্রতি চাহিয়া তাঁহার অসমাপ্ত বাক্য এইভাবেই শেষ করিলেন।

উত্তর-প্রত্যুত্তরের যে প্রবাহটা এতক্ষণ অনর্গল বহিয়া আসিতেছিল এইখানে তাহাতে বাধা পড়িল। কমলকিরণের বাক্য ও ইঙ্গিতের সমতা রক্ষা করিয়া আলেখ্যের মুখ দিয়া যাহা বাহির হইবে বলিয়া সকলে প্রত্যাশা করিল, তাহা বাহির হইল না। কারণ, অমরনাথ লোকটিকে পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ বলিয়া গালাগালি দেওয়াও যদি বা চলে, অশিক্ষিত বলা চলে না। অন্ততঃ শিক্ষার যে-সকল ট্রেডমার্ক, ছাপছোপ ভদ্রসমাজে প্রচলিত, তাহার অনেকগুলিই যে ওই লোকটির গায়ে ছাপ দেওয়া আছে, আলেখ্য তাহা জানিত। আরও একটা কথা এই যে, গাঙ্গুলী-মহাশয়ের আত্মহত্যায় বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া গ্রামের আর যাহারাই কেননা আন্দোলন করিয়া থাকুক, অমবনাথ করে নাই। এ কথা শুধু সে তাহাব নিজের মুখ হইতে নয়, অপরের মুখ হইতেও শুনিয়াছিল। স্বর্গীয় গাঙ্গুলীর দুর্ভাগ্য ও দুঃস্থ পরিবারের জন্য অমরনাথ অনেক করিয়াছে, কিন্তু আলেখ্যের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াইবার প্রতিকূলেও সে কম যত্ন করে নাই। এ কথা সত্য, এবং সত্য বলিয়া আলেখ্যের নিজেরও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কিন্তু এখন ঝোঁকের উপর কথাটা যখন আর একপ্রকার দাঁড়াইল, বিরক্তির মাত্রাধিক্যে এই অনুপস্থিত লোকটির স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপাইবার অশোভন উদ্যমে একটা মিথ্যা ভারও যখন চাপিয়া গেল, তখন তাহাকে মিথ্যা জানিয়াও আলেখ্য প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

স্পষ্টই বুঝা গেল, সাহেব অন্তরে বেদনা বোধ করিলেন, কিন্তু শক্ত কথা সহজে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত না, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শুধু কহিলেন—তাই ত, এ কাজটা তার ভাল হয়নি। কিন্তু সাধারণতঃ এ রকম সে করে না।

কমলকিরণ কহিলেন—সাধারণতঃ বাবার মোটরের কাচও লোকে ভাঙে না মিস্টার রে।

সাহেব বলিলেন—হুঁ।

কমলকিরণ কহিলেন—আমার মনে হয়, আলেখ্য যা বলছিলেন, এদের পরের উপকার, অর্থাৎ অপরের অপকার করার এ্যাক্টিভিটি একটু সংযত করে আনা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কোন একটা এফেক্টিভ চেক—

সাহেব অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—হুঁ, প্রয়োজন হলে করতেই হবে বৈ কি।

কমলকিরণ বলিলেন—আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্টার রে, কিন্তু আপনি নিজে জমিদার হলেও অনেক বিষয়ে ইনডিফারেন্ট ; আমি কয়েকটা বড় এস্টেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে একটা ব্যাপার সর্বত্রই ওয়াচ্ করে যাচ্ছি ! কতকগুলো স্বদেশী ছাপমারা প্যাট্রিয়টের পেশাই হয়ে দাঁড়িয়েছে জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে

দেওয়া। বলশেভিক প্রোপাগাণ্ডা ও তাদের টাকাই হচ্ছে এর মূলে। আপনি নিশ্চয় জানবেন মিস্টার রে, গভর্নমেণ্ট এমন অনেক কথাই জানে, যা এদেশের জমিদাররা ভ্রমও করে না। গোড়াতেই বিশেষ একটু সচেতন না হলে সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, আপনি নিশ্চয় জানবেন।—এই বলিয়া দুশ্চিন্তায় মুখ কালো করিয়া তিনি অপর দুইটি শ্রোতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

কিন্তু জমিদারি যাঁহার, তাঁহার মুখে আশঙ্কার কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইল না, শান্তভাবে তিনি বলিলেন—পশ্চিমের ব্যাপাব আমি ঠিক জানিনে বটে, কিন্তু আমাদের এই বাঙলাদেশে রাজা প্রজার সম্বন্ধ একটু অন্য রকমের, কমল! কিছু করা যদি তোমরা দরকার বোঝ, কর, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই।

কমল প্রতিবাদ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—পঁচিশ বৎসর পূর্বে যা ছিল, আজও ঠিক তাই আছে, কোন চেঞ্জ হয়নি, এ আপনি কি করে মনে করছেন ?

সাহেব কহিলেন—চেঞ্জ হয়নি, এ ত আমি বলিনি।

কমল কহিলেন, আমিও ত ঠিক সেই ভয়ের কথাই বলছি মিস্টার রে।

সাহেব হাসিলেন। বলিলেন—কমল, শিক্ষার গুণে হোক, সময়ের গুণে হোক, জমিদারদের অত্যাচারের ফলে হোক, দেশের প্রজাদের মধ্যে যদি এতবড় পরিবর্তনই এসে থাকে, জমিদার তারা চায় না, দু-দিন আগে হোক, পরে হোক, তাদের যেতেই হবে, তোমরা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু শুধু যদি আমার এই ছোট্ট জমিদারিটুকুর কথাই বল, তাহলে এই কথাটা আমার শুনে রাখ যে, প্রজাদের আমি বাস্তবিক ভালবাসি। জমিদার হিসাবে নিজে কখনও অত্যাচার করিনি, কর্মচারীদের সাধ্যমত করতে দিইনি। এ তারা জানে। আলো এই সম্বন্ধটুকুই যদি ভবিষ্যতে বজায় রেখে যেতে পারে ত তার ভয় নেই। কিন্তু আমার যে আবার রাত হয়ে যাচ্ছে—

এতক্ষণে বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে আলেখ্য একটি কথাও যোগ করে নাই, কিন্তু পিতা উঠিবার উপক্রম করিতেই সে বলিয়া উঠিল—বাবা, তুমি কি আমাকে লক্ষ্য করে এ কথা বললে ?

পিতা সহাস্যে কহিলেন—লক্ষ্য করে কেন মা, তোমার নাম ধরেই ত এ কথা বললাম।

কন্যা জিজ্ঞাসা করিল—কতবার আমাদের প্রাপ্য খাজনা তুমি মাপ করে দিয়েছ, বাবা, তোমার মনে আছে ?

আছে বৈ কি মা।

তুমি কি আমাকে প্রজাদের সেই অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে বল বাবা ?

সাহেব সস্নেহকণ্ঠে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—প্রাপ্য মানেই ন্যায্য নয় আলো—

আমাদের যা প্রাপ্য, প্রজাদের তা ন্যায্য দেয় না-ও হতে পারে। আমি সেইটুকু কেবল তাদের ক্ষমা করে এসেছি।

কমলকিরণ ইহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারিল না, কিন্তু আলেখ্য পারিল। ছেলেবেলা হইতেই পিতাকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত। মা তাঁহাকে দুর্বল বলিয়া যতই অবজ্ঞা করিতেন, ততই সে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবার পথ খুঁজিয়া ফিরিত। ঘরের ও বাহিরের উৎপীড়ন ও অপমান হইতে তাঁহাকে অহরহ রক্ষা করিবার একান্ত চেষ্টায় এই শক্তিহীন মানুষটিকে একদিন সে সত্য সত্যই চিনিতে পারিয়াছিল! তাঁহার চিন্তা ও বাক্যের কোন অর্থ বুঝিতেই তাহার কোনদিন বিলম্ব ঘটিত না। আজিও বুঝিয়াও প্রশ্ন করিল—বাবা, এই কি তোমার আদেশ? এমনিভাবেই কি চলতে আমাকে তুমি উপদেশ দাও?

সাহেব তৎক্ষণাৎ বারংবার মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—না, মা, এ আমার আদেশ নয়, তোমার পিতার উপদেশও নয়। এ সংসারে সবাই একভাবে চলতে পারে না—শক্তির অভাবেও বটে, প্রবৃত্তির অভাবেও বটে। যদি পারো, মনে মনে খুশী হ'ব, এইটুকুই শুধু তোমাকে বলতে পারি।

আলেখ্য কহিল—বাবা, আমার ভারী ইচ্ছে, কোথায় কি আছে, সব দেখে আসি। যেখানে হাঙ্গামা বেধেছে, নিজে একবার সেখানে যাই।

সাহেব সম্মতি দিয়া কহিলেন—বেশ ত মা, কালই আমি ম্যানেজারবাবুকে ডেকে সমস্ত উদ্যোগ করে দিতে বলবো। নদীতে এখন জল আছে, হয়ত শেষ পর্যন্তই বজরা যেতে পারবে।

ইন্দু এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই, জল-যাত্রার প্রস্তাবে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, বলিল—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো, আলো। কমলের প্রতি চাহিয়া কহিল, দাদা, তোমার কি এ সময়ে খুব জরুরী কাজ আছে? দু-চারদিন থেকে যেতে পারবে না?

কেন বল ত?

ইন্দু বলিল—আমাদের সঙ্গে যেতে। ছোট্ট নদী দিয়ে নৌকার মধ্যে যাওয়া-আসা, এ ত তোমার কক্ষনো হয়নি দাদা। যাবো?

কমলকিরণ আলেখ্যের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে তখন চাহিয়াছিল। মুখ দেখা গেল না, কিন্তু ভগিনীর আবেদনের ইঙ্গিত উপলব্ধি করিল। বুকের মধ্যে তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণে তাহা সংবরণ করিয়া নিস্পৃহকণ্ঠে কহিল—দেরী হয়ে যেতে পারে, কিন্তু—আচ্ছা বেশ, না হয় যাবো।

সাহেব ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—সেই ভাল। কিন্তু অমরনাথও শুনলাম যাবে; দেখো, যেন একটা বিবাদ না হয়। কিন্তু আমি এখন উঠি ইন্দু, গুড্‌নাইট।—এই বলিয়া চিন্তান্বিত মুখে আস্তে আস্তে তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। ('মাসিক বসুমতী', পৌষ ১৩৩১)

আট

এই রায়-পরিবারের জমিদারিটি আয়তনে ছোট, কিন্তু তাহার মুনাফা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল না। জমিদার চিরদিন প্রবাসে থাকেন, সুতরাং সমস্তই কর্মচারীদের হাতে ; এ অবস্থায় কাজকর্ম নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইবার কথা, কিন্তু প্রজারা ধর্মভীরু বলিয়াই হউক, বা অন্যমনস্ক-প্রকৃতি উদাসীন রে-সাহেবের ভাগ্য-ফলেই হউক, মোটের উপর ভালভাবেই এতদিন ইহা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছিল। কেবল উত্তরোত্তর আয় বাড়ানোর কাজটাই এতকাল স্থগিত ছিল বটে, কিন্তু চুরিটাও তেমনি বন্ধ ছিল। আলেখ্যের হাতে আসিয়া এই স্বল্পকালের মধ্যেই ইহার চেহারায় একটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। সুশৃঙ্খলিত করিবার অভিনব উদ্যম এখনও প্রজাদের গৃহ পর্যন্ত অতদূরে পৌঁছায় নাই বটে, কিন্তু তাহার আকর্ষণের কঠোরতা কর্মচারিবর্গ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলীর আত্মহত্যার পরে হঠাৎ মনে হইয়াছিল বটে, হয়ত ইহা এইখানেই থামিবে, কিন্তু হাটের ব্যাপার লইয়া আলেখ্যের কর্মশীলতা পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। যে আকস্মিক দুর্ঘটনা এই কয়দিন তাহাকে লজ্জিত বিষণ্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, কাল অমরনাথের সহিত মুখোমুখি একটা বচসার মত হইয়া যাইবার পরে সে ভাবটাও আজ তাহার কাটিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে আর সন্দেহমাত্র ছিল না যে, এ সংসারে যাহাদের কোথাও কিছু আছে, তাহা কোনক্রমে নষ্ট করিয়া দেওয়াটাকেই কতকগুলি লোক দেশের সবচেয়ে বড় কাজ বলিয়া ভাবিতে শুরু করিয়া দিয়াছে এবং অমরনাথ যত বড় অধ্যাপকই হউক, সে-ও এই দলভুক্ত।

স্থির হইয়াছিল, সম্পত্তির কোথায় কি আছে, নিজে একবার পরিদর্শন করিয়া আসিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যেই আজ সকাল হইতে বৃদ্ধ ম্যানেজারবাবুকে সুমুখে রাখিয়া আলেখ্য কমলকিরণের সাহায্যে একটা ম্যাপ তৈরি করিতেছিল। পথঘাট ভাল করিয়া জানিয়া রাখা প্রয়োজন। উভয়ের উৎসাহের অবধি নাই, দিনের স্নানাহার আজ কোনমতে সারিয়া লইয়া পুনরায় তাঁহারা সেই কর্মেই নিযুক্ত হইলেন। এমনি করিয়া বেলা পড়িয়া আসিল।

সঙ্গীর অভাবে ইন্দু মাঝে মাঝে গিয়া তাহাদের টেবুলে বসিতেছিল, কিন্তু সেখানে তাহার প্রয়োজন নাই, তাই অধিকাংশ সময়ই বাটীর চারিপাশে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইয়া সময় কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমনি সময়ে দেখিতে পাইল, সাহেব পদব্রজে বাহির হইয়া যাইতেছেন। দ্রুতপদে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহেব চকিত হইয়া কহিলেন—তুমি একলা যে ইন্দু ?

ইন্দু কহিল—দাদারা ম্যাপ তৈরি করছেন, এখনও শেষ হয়নি।

কিসের ম্যাপ ?

ইন্দু কহিল—তারা জমিদারি দেখতে যাবেন, পথ-ঘাট কোথায় আছে না আছে,

সেই সমস্ত ঠিক করে নিচ্ছেন।

সাহেব সহাস্যে বলিলেন—আর সেখানে তোমার কোন কাজ নেই, না ইন্দু ?

ইন্দু হাসিয়া সে কথা চাপা দিয়া কহিল—আপনি কোথায় যাচ্ছেন, কাকাবাবু ?

এই সম্বোধন আজ নূতন। সাহেব পুলকিত বিস্ময়ে ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—আমার ছেলেবেলার এক সঙ্গী পীড়িত হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন, তাঁহাকেই একবার দেখতে যাচ্ছি, মা।

—আপনার সঙ্গে যাব কাকাবাবু ?

সাহেব কহিলেন, সে যে প্রায় মাইল খানেক দূরে, ইন্দু। তুমি ত অতদূরে হাঁটতে পারবে না, মা। আমি আরও ঢের বেশী হাঁটতে পারি, কাকাবাবু। এই বলিয়া সে সাহেবের হাত ধরিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া পড়িল। গাড়িখানা প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইবার প্রস্তাব সাহেব একবার কহিলেন বটে, কিন্তু ইন্দু তাহাতে কান দিল না।

গ্রাম্যপথ। সুনির্দিষ্ট চিহ্ন বিশেষ নাই। পুকুরের পাড় দিয়া গোয়ালের ধার দিয়া, কোথাও বা কাহারও প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়া গিয়াছে, ইন্দু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। ছেলেমেয়েরা ছুটিয়া আসিল, পুরুষেরা জমিদার দেখিয়া কাজ ফেলিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, বধূরা দূর হইতে অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়া কৌতূহল মিটাইতে লাগিল। একটুখানি নিরালায় আসিয়া ইন্দু কহিল, এরা আমাদের মত মেয়েদের বোধ হয় আর কখনও দেখেনি, না ?

সাহেব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—খুব সম্ভব তাই।

ইন্দু কহিল, এদের চোখে আমরা যেন কি এক রকম অদ্ভুত হয়ে গেছি, না কাকাবাবু ?—কথাটি বলিতে হঠাৎ যেন তাহার একটুখানি লজ্জা করিয়া উঠিল।

সাহেব জবাব দিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন। দুই-চারি পা নিঃশব্দে চলিয়া ইন্দু বলিয়া উঠিল—এরা কিন্তু এক হিসাবে বেশ আছে, না কাকাবাবু ?

সাহেব পুনরায় হাসিলেন, কহিলেন—এক হিসেবে সংসারে সবাই ত বেশ থাকে, মা।

ইন্দু বলিল, সে নয়, কাকাবাবু। এক হিসাবে আমাদের চেয়ে এরা ভাল আছে, আমি সেই কথাই বলছি।

বৃদ্ধ ইহার কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা মা, এদের মত কি তোমরাও এমনিভাবে জীবন যাপন করতে পার ?

ইন্দু কহিল তোমরা আপনি কাদের বলছেন, আমি জানিনে। যদি আলোকে বলে থাকেনত সে পারে না। যদি আমাকে বলে থাকেন ত আমি বোধ করি পারি।—এই বলিয়া সে মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল—বাবা মা আমার ওপরে বেশী খুশী নন, আমাদের সমাজের মেয়েরা লুকিয়ে আমাকে ঠাট্টা-তামাশা করে, কিন্তু কি জানি কাকাবাবু, আমার ভেতরে কি আছে, আমি কিছুতেই তাদের

সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারিনে। অনেক সময়েই আমার যেন মনে হয়, যেভাবে আমরা সবাই থাকি, তার বেশীর ভাগই সংসারে নিরর্থক। মা বলেন, সভ্যতার এ-সকল অঙ্গ, সভ্য মানুষের এ সব অপরিহার্য। কিন্তু আমি বলি, ভালই যখন আমার লাগে না, তখন অত সভ্যতাতেই বা আমার দরকার কিসের?

তাহার কথা শুনিয়া, তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া সাহেব মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কিছুই বলিলেন না। ইন্দু অযাচিত অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়া নিজের প্রগল্‌ভতায় লজ্জা পাইল। তাহার চৈতন্য হইল যে, সাহেবের মুখের উপর আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে যাওয়া ঠিক হয় নাই। এখন কতকটা সামলাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে কহিল, যাঁদের এ-সব ভাল লাগে, তাঁদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিনি, কাকাবাবু। কিন্তু যাঁদের ভাল লাগে না, বরঞ্চ কষ্ট বোধ হয়, তাদের এততে দরকার কি? আপনি কিন্তু আমার ওপর রাগ করতে পারবেন না, তা বলে দিচ্ছি।

সাহেব প্রত্যুত্তরে শুধু হাসিমুখে কহিলেন,—না মা, রাগ করিনি।

ইন্দু বলিতে লাগিল—এই যে-সব মেয়েরা সসঙ্কোচে পথের একধারে সরে দাঁড়াচ্ছে, পুরুষরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে কেউ আপনাকে প্রণাম করছে, কেউ সেলাম করছে, এদের সঙ্গে আমাদের কিছুই ত মেলে না, কিন্তু এরা কি সব বর্বর? হ'লই বা খালি পা, তাতে লজ্জা কিসের? পরকে সম্মান দিতে ত এরা আমাদের চেয়ে কম জানে না, কাকাবাবু।

বৃদ্ধ এ প্রশ্নেরও কোন জবাব দিলেন না, তেমনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ইন্দু কহিল—আপনি একটা কথারও আমার জবাব দিলেন না, মনে মনে বোধ হয় বিরক্ত হয়েছেন।

একবার বৃদ্ধ কথা কহিলেন; বলিলেন—এটি কিন্তু তোমার আসল কথা নয়, মা। তুমি ঠিক জানো তোমার বুড়ো কাকাবাবু মনে মনে তোমাকে আশীর্বাদ করছেন বলেই কথা কবার তার ফুরসত হচ্ছে না। আচ্ছা, তোমার দাদা কি বলেন, ইন্দু? এই বলিয়া তিনি উৎসুক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এই ঔৎসুক্যের হেতু বুঝিতে ইন্দুর বিলম্ব হইল না, কিন্তু ইহার ঠিক কি উত্তর যে সে দিবে, তাহাও ভাবিয়া পাইল না।

কোন-কিছুর জন্যই নিরতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করা বৃদ্ধের স্বভাব নয়, ইন্দুর এই অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের কবে যাবার দিন স্থির হ'ল মা?

কোথায় কাকাবাবু?

জমিদারি দেখতে।

ইন্দু কহিল—আমাকে তাঁরা এখনও জানান নি। কিন্তু যদি সম্ভব হয়, সে-কটা দিন আমি আপনাদের কাছে থাকতে পারলেই ঢের বেশী খুশী হব, কাকাবাবু।

বৃদ্ধ কহিলেন—মা, এই আমার বন্ধুর বাড়ি। এস, ভেতরে চল।

ইন্দু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—ঐ ত সুমুখে খোলা মাঠ দেখা যাচ্ছে, কাকাবাবু, আমি কেন আধঘণ্টা বেড়িয়ে আসি না? আমার সঙ্গে ত এদের কোনরূপ পরিচয় নেই।

বৃদ্ধ কহিলেন—ইন্দু, এ আমাদের পাড়াগাঁ, এখানে পরিচয়ের অভাবে কারও ঘরে যাওয়ায় বাধে না। কিন্তু তোমাকে আমি জোর করতেও চাইনে।—একটু হাসিয়া বলিলেন, তবে রোগীর ঘরের চেয়ে খোলা মাঠ যে ভাল, এ আমি অস্বীকার করিনে। যাও, শুধু এইটুকু দেখো, যেন পথ হারিয়ো না।—এই বলিয়া তিনি ইন্দু অগ্রসর হইতেই কহিলেন, আর এই মাঠের পরেই বরাট গ্রাম। যদি খানিকটা এগোতে পারো, সুমুখেই অমরনাথের টোল দেখতে পাবে। যদি দেখা হয়েই যায় ত ব'লো, কাল যেন সে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে। এই বলিয়া তিনি সদরের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

নয়

মাঠের ধার দিয়া চলন-পথ বরাবর বরাট গ্রামে গিয়ে পৌঁছিয়াছে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াও ইন্দু সোজা গিয়া গ্রামের তেমাথায় উপস্থিত হইল। বিরাট একটা বটবৃক্ষের ছায়ায় অমরনাথের চতুষ্পাঠী, দশ-বারোজন ছাত্রপরিবৃত হইয়া তিনি ন্যায়ের অধ্যাপনায় নিযুক্ত, এমনি সময়ে ইন্দু গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। অতি বিস্ময়ে প্রথমে অমরনাথের বাক্যস্ফূর্তি হইল না, কিন্তু পরক্ষণে সশিষ্য গাত্রোত্থান করিয়া বহুমানে সংবর্ধন করিয়া কহিলেন—একি আমার পরম ভাগ্য! আর সকলে কোথায়?

একজন ছাত্র আসন আনিয়া দিল। অনভ্যাসবশতঃ ইন্দুর প্রথমে মনে পড়ে নাই, সে আর একবার নীচে নামিয়া গিয়া, জুতা খুলিয়া রাখিয়া আসিয়া উপবেশন করিয়া কহিল—আমি একাই এসেছি, আমার সঙ্গে কেউ নেই।

কথাটা বোধ হয় অমরনাথ ঠিক প্রত্যয় করিতে পারিলেন না, স্মিতমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।

ইন্দু কহিল - কাকাবাবুর সঙ্গে আমি বেড়াতে বার হয়েছিলাম। তিনি তাঁর এক পীড়িত বন্ধুকে দেখতে গেলেন। আমাকে বললেন, আপনাকে খবর দিতে, যদি পারেন, কাল একবার দেখা করবেন।

অমরনাথ কহিলেন—খবর দেবার জন্য ত জমিদারের লোকের অভাব নেই। কিন্তু এই যদি যথার্থ হয় ত বলতেই হবে এ আমার কোন অজানা পুণ্যের ফল। কিন্তু কার বাড়িতে রায়-মশায় এসেছেন শুনি?

ইন্দু কহিল—আমি ত তাঁর নাম জানিনে, শুধু বাড়িটা চিনি। কিন্তু আপনার নিজের বাড়ি এখান থেকে কতদূরে অমরনাথবাবু?

অমরনাথ কহিলেন—মিনিট দুয়ের পথ।

—আমাকে তা হলে একটু খাবার জল আনিয়ে দিন।

একজন ছাত্র ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরেই সাদা পাথরের রেকাবিতে করিয়া খানিকটা ছানা এবং গুড় এবং তেমনি শুভ্র পাথরের পাত্রে শীতল জল আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রয়োজন নাই বলিয়া ইন্দু প্রত্যাখান করিল না, ছানা ও গুড় নিঃশেষ করিয়া আহার করিল এবং জলপান করিযা কহিল—এখন তা হলে আমি উঠি?

অমরনাথ এই শিক্ষিত মেয়েটির নিরভিমান সরলতায় মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন অনাহূত আমার পাঠশালায় এসেই কিন্তু চলে যেতে আপনি পাবেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরেও একবার আপনাকে যেতে হবে। সেখানে আমার মা আছেন, ছোটবোন শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছেন। তাঁদের দেখা না দিয়ে আপনি যাবেন কি করে? চলুন।

ইন্দু তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল—চলুন। কিন্তু সন্ধ্যা হতে ত দেরি নেই কাকাবাবু যে ব্যস্ত হবেন?

অমরনাথ সহাস্যে কহিলেন—ব্যস্ত হবেন না। কারণ, তাঁকে খবর দিতে লোক গেছে।

টোল ঘরের পিছন হইতেই বাগান শুরু হইয়াছে। একটা মস্ত বড় পুকুর, তাহার চারিধারে কত যে কুলগাছ, এবং কত যে ফুল ফুটিযা আছে, তাহার সংখ্যা নাই। অমরনাথের পিছনে সদর-বাটীতে প্রবেশ করিয়া ইন্দু দেখিল, প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপের একধারে দিনান্তের শেষ আলোকে বসিয়া জন-দুই ছাত্র তখনও পুঁথি লিখিতেছে, অন্যধারে পাঁচ সাতটি চিক্কণ পরিপুষ্ট সবৎসা গাভী ভূরিভোজনে নিযুক্ত, একটা মস্ত বড় কালো কুকুর একমনে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছিল, অভ্যাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ল্যাজ নাড়িয়া অভ্যর্থনা করিল। সমস্ত পূর্বদিকটা বড় বড় ধানের মরাই গৃহস্থের সৌভাগ্য সূচিত করিতেছে; একটা জবার গাছ ফুলে ফুলে একেবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দু ভাল করিয়া সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

মাটির বাড়ি। আট-দশটি উচ্চ প্রশস্ত ঘর। প্রাঙ্গণ এমন করিয়াই নিকানো যে, জুতা পায়ে দিয়া প্রবেশ করিতে ইন্দুর যেন গায়ে লাগিল। সেইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে, ধূপধূনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে সমস্ত গৃহ যেন পরিপূর্ণ হইযা উঠিয়াছে।

অমরনাথের বিধবা দিদি ঠাকুরঘরে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু খবর পাইয়া তাহার মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোটবোন ছেলে কোলে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু অমরনাথের জননীকে প্রণাম করিল। তিনি হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন এবং যে দুই-চারটি কথা উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে ইন্দুর

মনে হইল, এত বড় আদর ইহজীবনে আর কখনও সে পায় নাই। দাওয়ার উপরে বসিতে তিনি স্বহস্তে আসন পাতিয়া দিলেন।

ইন্দ্র উপবেশন করিলে অমরের জননী কহিলেন—গরীবের ঘরে ঠিক সন্ধ্যার সময় আজ মা কমলা এলেন।

ইন্দ্র শিক্ষিতা মেয়ে, কিন্তু মুখে তাহার হঠাৎ কথা যোগাইল না। শিক্ষা, সংস্কার ও অভ্যাসবশতঃ জাতির কথা তাহাদের মনেও হয় না, কিন্তু আজ এই শুদ্ধাচারিণী বিধবা জননীর সম্মুখে কেমন যেন তাহার সঙ্কোচ বোধ হইল। কহিল—মা, আপনারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমি কায়স্থের মেয়ে। আপনি আসন পেতে দিলেন?

গৃহিণী স্নিগ্ধহাস্যে কহিলেন—তুমি যে সন্ধ্যার সময়ে আমার ঘরে লক্ষ্মী এলে। দেবতার কি জাত থাকে, মা, তুমি সকল জাতের বড়।

অমরের ছোটবোন বোধ হয় ইন্দ্রর সমবয়সী। সে কাছে আসিয়া বসিতেই ইন্দ্র তাহার ছেলেকে কোলে টানিয়া লইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নামটি কি মা?

ইন্দ্র কহিল—মা, আমার নাম ইন্দ্র।

মা কহিলেন—তাই ত বলি মা, নইলে কি কখনও এমন মুখের শ্রী হয়!

ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া মুচকিয়া হাসিয়া কহিল—কিন্তু আর একদিন এলে যে তখন কি বললেন, আমি তাই শুধু ভাবি।

মাও হাসিয়া কহিলেন—ভাবতে হবে না মা, আমিই ভেবে রেখেছি, সেদিন তোমাকে কি বলবো। কিন্তু আসতে হবে।

ইন্দ্র স্বীকার করিল। অমরের দিদি ঠাকুরঘর হইতে ছুটি পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন—ঠাকুরের আরতি হতে বেশী দেরি নেই ইন্দ্র, তোমাকে কিছু-একটু মুখে দিয়ে যেতে হবে।

ইন্দ্র তাঁহার পরিচয় অনুমান করিয়া লইয়া বলিল, খাওয়া আমার আগেই হয়ে গেছে দিদি, আর একদিন এসে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যাবো, আজ আর আমার পেটে জায়গা নেই।—এই বলিয়া সে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিল যে, এ স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে আর একদিন আসিয়া সে ঠাকুরের প্রসাদ ও মায়ের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিয়া যাইবে।

ইন্দ্র বাটী হইতে যখন বাহির হইল, তখন সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। অমরনাথের হাতে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন, ইন্দ্র কহিল—আলোটা আর কাউকে দিন, আমাকে পেঁছে দিয়ে আসবে।

অমরনাথ কহিলেন—পেঁছে দেবার লোক আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

তার মানে?

তার মানে আপনি অনাহূত আমার ঘরে এসেছিলেন। এখন পেঁছে দিতে যদি আর কেউ যায় ত আমার অধর্ম হবে।

কিন্তু ফিরতে যে আপনার রাত্রি হয়ে যাবে, অমরনাথবাবু ?

তার আর উপায় কি ? পাপ অর্জন করার চেয়ে সে বরঞ্চ ঢের ভাল।

ইন্দু কহিল—তবে চলুন। কিন্তু আজ আমার একটা ভুল ভেঙ্গে গেল। আমরা সবাই আপনাকে বড় দরিদ্র ভাবতাম।

অমরনাথ মৌন হইয়া রহিলেন।

ইন্দু কহিল—আপনাদের বাড়ি ছেড়ে আমার আসতে ইচ্ছে করছিল না। আমার ভারী সাধ হয় আলোদের বাড়ি ছেড়ে আমি দিন কতক মায়ের কাছে এসে থাকি।

অমরনাথ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—অত বড় সৌভাগ্যের কল্পনা করতেও আমাদের সাহস হয় না। ('মাসিক বসুমতী', বৈশাখ, ১৩৩২) *

দশ

রে-সাহেব তাঁহার অসুস্থ বাল্যবন্ধু বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্য্যের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার বাড়ির সম্মুখস্থ অপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। এতক্ষণ ইন্দু তাঁহাকে সঙ্গদান করিয়াছে। কিন্তু অপরিচয়ের অজুহাত দেখাইয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সাহেবও তাহাকে পীড়াপীড়ি করেন নাই। একে অপরিচিত, তাহার উপর রোগীর বাড়ি। এইরকম পরিস্থিতিতে পরিবেশটি তাহার নিকট সুখকর না হওয়াই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া কাহারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের প্রভাব খাটানো সাহেবের স্বভাববিরুদ্ধ। এমন কি নিজের মেয়ে আলেখ্যর উপরও এইরকম কোন প্রয়াস কোনদিনই তিনি করেন নাই।

ইন্দু সাহেবের অনুমতি পাইয়া খোলা মাঠের উপর দিয়া কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করিয়া সুন্দর বৈকালটি উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে একটু আগেই বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সাহেব তাঁহার বাল্যবন্ধুর বাড়ির সম্মুখস্থ অপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়া তাঁহার অবস্থার উন্নতি—অবনতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলিয়া বার কয়েক দেখিয়া তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, বন্ধু বিদ্যাসুন্দর দারিদ্র্যের চরম সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছেন। একদিন যেইখানে চার ভিটায় চারটি চৌচালা ঘর ছিল। আজ সেইখানে একটিমাত্র একচালা ঘর দাঁড়াইয়া আছে। শুধু কি তা-ই ? দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে তাহাও জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাল্যবন্ধু চরমতম দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার মনটি অকস্মাৎ বেদনায় ভরিয়া উঠিল। বাহিরের অবস্থা যাহার এই, ভিতরে যাইয়া তাঁহাকে কিরূপ পরিস্থিতির

মুখোমুখি হইতে হইবে বুঝিতে বাকী রহিল না।

সাহেব বিষাদ ক্লিস্ট মনে ধীর-পায়ে বাল্যবন্ধু বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্য্যের ভিতর-বাড়ির দিকে আগাইয়া গেলেন। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সে-দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইল তাহা যেমন অবিশ্বাস্য, ঠিক তেমনই বেদনাদায়কও বটে। এমন কোন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি মনের দিক হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তাঁহাকে আচমকা একটি হোঁচট খাইতেই হইল। সম্মুখে, রোয়াকে চৌকির উপর দেয়ালে হেলান দিয়া রোগজীর্ণ যে পুরুষ মূর্তিকে আধ-শোয়া অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিলেন, ইনিই যে তাঁহার বাল্যবন্ধু, না বলিয়া দিলে চিনিবার উপায় নাই। বয়সের দিক হইতে তাহার তুলনায় তেমন কিছু বেশী হইবার কথা নয়। বড় জোর সত্তরের কাছাকাছি হইবে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন অভাব অনটন ও দুরারোগ্য ব্যাধির দৌরাত্মে বয়স যেন অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশ বছর বেশী বলিয়াই ভ্রম হইতেছে। রোগ-যন্ত্রণাকাতর এই অকালবৃদ্ধটিই যে তাঁহার বাল্যবন্ধু বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্য্য ইহা বিশ্বাস করিতে তিনি এতটুকুও উৎসাহ পাইলেন না।

রোয়াকের অপর প্রান্তে এক বৃদ্ধা বলিলে হয়ত যথার্থ বলা হইবে না। বরং অতি-বৃদ্ধা বলাই সঙ্গত। যাহাই হউক, বৃদ্ধাটি হামানদিস্তায় কি যেন জীর্ণ করিতেছেন। বোধ হয় পান। অকস্মাৎ এক অপরিচিত আগন্তুককে দেখা মাত্র বৃদ্ধাটি যন্ত্রচালিতের মত দাঁড়াইয়া পড়িলেন। সামান্য পাশ ফিরিয়া ঘোমটাটি বুক পর্যন্ত টানিয়া দিলেন।

চৌকিতে নীরবে বসিয়া থাকা পুরুষ মূর্তিটি চোখ মেলিয়া সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি স্থির।

সাহেবের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, তাঁহার বন্ধুবর চোখ দুইটিও হারাইয়াছেন।

বৃদ্ধা ঘোমটার আড়াল হইতে ভীত-সন্ত্রস্ত অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন হইয়াছে? কি নাম?

সাহেব নিজের নাম ও পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন। রাধামাধব নামটি কানে যাইতেই বিদ্যাসুন্দর বাবুর মধ্যে এক অবর্ণনীয় চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইল। চৌকি হইতে নামিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

সাহেব দুই পা আগাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আরে! করছ কি বিদ্যা! পড়ে যাবে যে!

বিদ্যাসুন্দরবাবু তাঁহার শীর্ণ ও কম্পিত হাত দুইটি সাহেবের গায়ে-মাথায় বুলাইতে লাগিলেন। অস্থিরচিত্ত বিদ্যাসুন্দরবাবু বলিলেন, রাধামাধব, কতদিন পর তোমায় কাছে পেলুম বন্ধু! কাছে এসো। আর একটু কাছে এসো! দেখি, একটু মোটাসোটা হয়েছ, নাকি আগের মত সেই রোগা লিকপিকে পাটকাঠিটিই রয়ে গেছ? তারপর ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন—কইগো কোথায় গেলে? দেখ কে এসেছে! গরীবের বাড়ি হাতীর পায়ের ছাপ পড়েছে! আমার বাড়ি জমিদারের পায়ের ধুলো পড়েছে, কী সৌভাগ্য আমার! বসতে দাও—বসতে দাও! সাহেব বলিলেন-ব্যস্ত

হবেন না, আমি এখানেই বসছি।

সাহেব ম্লান হাসিয়া ভয়ে ভয়ে জীর্ণ চৌকিটির উপর বসিলেন। কারণ, চৌকির মালিকের মতই চৌকিটিও জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। দীর্ঘদিন সেবা করিয়া আজ অক্ষমতা প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। পায়াগুলি নড়বড়ে, তক্তায় ঘুণ ধরিয়াছে, মরিচা পড়িয়া পেরেকগুলি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

বিদ্যাসুন্দরবাবু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—রাধামাধব, কবে এলে? তারপর শরীর ও মন সুস্থ ত?

সাহেব ম্লান হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, ভালই আছি।

আমি ত সবদিক থেকে পঙ্গু হয়ে শয্যা নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ। তুমি গাঁয়ে এসেছ শুনে মনে বড়ই চাঞ্চল্যবোধ করছিলাম। ভেবেছিলুম, তোমার সাহচর্যে কিছু-সময় কাটিয়ে, দু'-চারটে মনের কথা বলুলে হয়ত স্বস্তি পাব।

তাই ত আমিই ছুটে এলুম বিদ্যাসুন্দর। গাঁয়ে পা দিয়েই তোমার খবর নিয়েছি! শুনলুম তুমি অসুস্থ। শয্যাশায়ী। তাই একবারটি চোখের দেখা দেখে যাবার জন্য ছুটে আসতেই হ'ল।

আমার যে আর সে উপায়ও নেই। দেহের সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোও গেছে। একে বাতে পঙ্গু, তার ওপর চোখ দুটো হারিয়ে একেবারেই অচল হয়ে পড়েছি।

তা এখন কেমন বোধ করছ, বল ত?

পিতৃদত্ত জীবনটাকে এখনও কোন রকমে টিকিয়ে রেখেছি, এই যা। পরপারের ডাক এসে গেছে। এখন রওনা দিলেই হয়ে যায়।

ক্ষণিক ইতস্ততের পর সাহেব এইবার বললেন—একটা কথা জিজ্ঞেস করছি ভাই, কিছু মনে কোরো না যেন।

কি? কি কথা? এত ইতস্ততের কি আছে, বলেই ফেল না?

সবদিক থেকে তুমি এমন ভেঙে পড়লে কি করে, বলবে কি? স্বাভাবিকের তুলনায় বড্ড বেশী রকমই বুড়িয়ে গেছ যেন! কি করে এমন হ'ল বিদ্যাসুন্দর?

ম্লান হাসিয়া বিদ্যাসুন্দরবাবু বলিলেন—কোনটা শুনতে চাচ্ছ, শরীর, নাকি আর্থিক পরিস্থিতির কথা?

উভয়ই।

শরীরের কথাই আগে বলছি শোন, আমার শরীরের এ-শোচনীয় পরিণতির সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকটের যে কোন ভূমিকা নেই, বলা চলে না। হাঁপানি রোগটা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। তার সঙ্গে বাত-রোগ এসে বাসা বেঁধেছে। এই দুই রিপু রেশারেশী করে আমার কর্মক্ষমতা লোপ করে দিল। আর চোখের ব্যাপারটা? খাদ্যপ্রাণের অভাবে দৃষ্টিশক্তি লোপ লাগে, এ আর নতুন কথা কি বন্ধু।

সাহেব চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

বিদ্যাসুন্দরবাবু বলিয়া চলিলেন—সবই ভবিতব্য রাধামাধব। সবই ভবিতব্য!

এই চার আঙুল কপালটায় জন্মলগ্নে যেটুকু লিখে দেয়া হয়েছে, খণ্ডন করে মানুষের সাধ্য কি ! পৈতৃকসূত্রে বিঘা পাঁচেক জমি ছিল। তার ওপর একটু আধটু যজন-যাজন ক্রিয়া করেও যৎসামান্য আয় উপার্জন হ'ত। কোনরকমে শাক-ভাতের অভাব হ'ত না। কিন্তু বিধাতা পুরুষের এটুকুও সহ্য হ'ল না। হাত-পা ভেঙে পঙ্গু করে বাড়িতে ফেলে রাখলে। হাতের কাছে এমন অবলম্বন কেউ ছিল না সে আমাদের বুড়োবুড়ির ভরণপোষণের ভার নেবে! দীর্ঘশ্বাস ফেলে এইবার বললেন—একটা মেয়ে ছিল। থেকেও নিষ্ঠুর বিধাতা বঞ্চিত করলে! নইলে হয়ত দুর্ভোগ্য এমন প্রকট হতে পারত না। বিধাতারই বা দোষ দেব কি ? এতবড় মেয়ে চোখের সামনে অচিকিৎসায় মারা গেল! বাপ হয়ে কিছু করতে পারলুম না রাধামাধব—কিছু করতে পারলুম না! একদিক থেকে ভালই হয়েছে, কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে দিয়েছেন। নইলে তাকে নিয়ে আমারও দুর্ভোগ, তারও অশান্তি কম হ'ত না!

হয়েছিল কি ?

কাল ব্যাধি! ওলওঠা হলেই যে সবাই মারা যায়, তা—ত নয়। আমার অদৃষ্টে কিন্তু হ'ল তাই। আমার দৈন্যদশা তখন চরমে পৌঁছেছে। জমিজিরাত যেটুকু ছিল, অনেক আগেই উদরে ঢুকেছে। আর হবে না-ই বা কেন ? বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও দু'দিনে শূন্য হয়ে যায়! আর আমার ত ছিল মাত্র সাকুল্যে বিঘা পাঁচেক জমি। তারপর থালা-ঘটি যা ছিল এক-এক করে বিক্রি করে পেটের জ্বালা নিভাতে লাগলুম। এখন বসতভিটাটুকুই সম্বল। এটুকু থাকতে থাকতে বুড়োবুড়ি যেতে পারলে অন্ততঃ গৃহহারা হবার অনুতাপটুকু সইতে হ'ত না! কয়েক মুহূর্ত নীরবে দম নিয়ে তিনি এইবার বললেন –এতক্ষণ শুধুই আমার দুঃখের পাঁচালি গাইলুম বন্ধু। এতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা, কোথায় দুটো ভাল ভাল কথা হবে, তা নয় নিজের দুঃখের পাঁচালি জুড়ে দিলাম! তারপর তোমার কথা কিছু বল, জমিদারি কাজকর্ম কেমন চলছে ?

সাহেব এতক্ষণ ছেলেবেলার সেই সুখের দিনগুলির ভাবনায় আত্মমগ্ন ছিলেন। বিদ্যাসুন্দরবাবুর কথায় যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন।

সাহেবের দীর্ঘ নীরবতা লক্ষ করিয়া বিদ্যাসুন্দরবাবু বলিলেন—কি হে রাধামাধব, চলে গেলে নাকি ?

সাহেব মুহূর্তে নিজেকে একটু সামলাইয়া বলিয়া উঠিলেন—না, চলে যাব কেন! এই ত তোমার কাছেই রয়েছি। পাশেই বসে।

কোন সাড়াশব্দ নেই কিনা, ভাবলুম কি ব্যাপার, চলে—

তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না দিয়া সাহেব বলিলেন—পুরণো দিনের সেসব কথা ভাবছিলুম।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিদ্যাসুন্দরবাবু বলিলেন—সে সব কথা আজ ভাবলে রূপকথা বলেই মনে হয়, তাই না রাধামাধব! তারপর বল, তুমি কেমন আছ ? জমিদারি

কাজকর্ম কেমন চলছে ?

সাহেব বলিলেন—জমিদারিটুকু আছে, এই যা। বলতে প্যার, একটা মজা নদীমাত্র। নদী মজে গেলে কেবলমাত্র একটা মরুরেখা যেমন অবশিষ্ট থাকে, আমার জমিদারিও আজ ঠিক সে পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। মজা নদী যেমন কারো কোন উপকারেই লাগে না বরং অপরের বিড়ম্বনা বাড়ায় মাত্র, আমার জমিদারির অবস্থাও আজ ঠিক তা-ই।

বিদ্যাসুন্দরবাবু আগ্রহান্বিত হইয়া বলিলেন—ঠিক বুঝলাম না বন্ধু। সামান্য নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া বলিলেন—একটু খোলসা করে বল।

জমিদারির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। আয়ের থেকে ব্যয় বেশী হলে যা হয়, এই আর কি।

কিছু মনে কোরো না বন্ধু, এর জন্য কিন্তু আমি তোমাকেই দোষারোপ করব। নিজে হাতে সর্বনাশ করলে তুমি। কথায় বলে, দুধেল গরুর দুধ থাকে তার মুখে। তাকে যত্নআত্তি করলে তবেই না সে আশানুরূপ দুধ দেবে। আর তুমি করলে তার ঠিক বিপরীত। পৈতৃকসূত্রে জমিদারির মালিকানা পেয়েই তুমি গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে শহরে। ভুলে গেলে প্রজাদের ওপর জমিদারের প্রাথমিক কর্তব্যের কথা। আরে বন্ধু, নিজের ছেলের ওপর বাপের যেটুকু দরদ ভালবাসা থাকে অন্যের কাছ থেকে কি তা পুরোপুরি আশা করা যায় ?

তোমার হয়ত ভুল হচ্ছে, বিদ্যাসুন্দর। ম্যানেজার থেকে শুরু করে সামান্য গোমস্তা পর্যন্ত সবার সততার ওপর সমান আস্থা রয়েছে আমার।

আমি কিন্তু বলছি নে, তারা সবাই অসৎ। বলতে চাইছি, জমিদারি তোমার, তারা সবাই রক্ষক। এসব ক্ষেত্রে কি দেখা যায় জমিদাররা শহরে বিলাস ব্যসনে মগ্ন থাকে। আর মনে করে গ্রামে তাদের একটা কল্পবৃক্ষ রয়েছে। প্রয়োজনের সময় তাতে ঝাঁকা দিলেই রুপোর চাকতি পড়তে থাকে, মিথ্যে বলেছি বন্ধু ?

সাহেব নীরবে তাহার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য শুনিতে লাগিলেন।

বিদ্যাসুন্দরবাবু বলিয়া চলিলেন—শহরের আনন্দ স্ফূর্তি ও হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে ডুবে থেকে তারা ভুলে যায়, সেই কল্পবৃক্ষে মাঝে মধ্যে সার প্রয়োগ ও জলসিঞ্চনেরও প্রয়োজন হয়। নইলে অযত্নে অবহেলায় সে কল্পবৃক্ষ একদিন শুকিয়ে যেতে পারে, চাহিদা পূরণে অক্ষম হয়ে পড়তে পারে, এ বোধটুকুও তাদের লোপ পেয়ে যায় বন্ধু। তোমার কথাই ধরা যাক রাধামাধব। তুমি জমিদারি পাওয়ার আগে থেকেই পশ্চিমের দেশে বসবাস করছিলে।

হ্যাঁ, বাবা জীবনের শেষের দিকে পশ্চিমের দেশে চলে যান। আমাকেও বাধ্য হয়ে—

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বিদ্যাসুন্দরবাবু বলিয়া উঠিলেন—তুমিও জমিদারবাবুর সঙ্গে দেশ ছাড়লে। শুরু হ'ল প্রবাস-জীবন। সেখান থেকেই

ওকালতি পাশ করলে। বিয়ে থা সেখানেই। তারপর ওকালতি পড়তে চলে গেলে বিলেতে। সেখান থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এলে। দেশের বাড়িতে নয়। ফিরে এলে সেই পশ্চিমের শহরেই। সেখানে থেকেই ওকালতি ব্যবসা করতে লাগলে। ওকালতির উপার্জন আর কল্পবৃক্ষ এই জমিদারির আয়-উপার্জনে তোমার সাচ্ছন্দ শতগুণ বেড়ে গেল। রীতিমত বিলাস ব্যসনের মধ্য দিয়ে স্ত্রী-কন্যা আর আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে দিন কাটাতে লাগলে।

তুমি ত আমার নাড়ি নক্ষত্র সবই জান দেখছি!

সবই জানি বন্ধু। পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে কারো উন্নতি বা অবনতি হলে তার খবরাখবর যে বাতাসে ভেসে আসে। উন্নতিতে আনন্দ যেমন হয়, অবনতিতে যন্ত্রণায় দগ্ধে মরতে হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। নীরবে একটু দম নিয়ে বিদ্যাসুন্দর বাবু আবার বলতে শুরু করলেন—যাক যে কথা বলছিলুম, তোমার জমিদারি রইল এখানে পড়ে, আর তুমি নিশ্চিন্ত আরামে প্রবাসে-জীবন যাপন করতে লাগলে। প্রজার সুখ-সুবিধার ক্ষেত্রে তুমি রইলে দীর্ঘদিন উদাসীন। তারা দিনেব পব দিন অসহায় ভাবে বঞ্চিত হতে লাগল। গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন হওয়ায় তাদের প্রতি তোমার দায়িত্বই বল আর কর্তব্যই বল একটু একটু করে লোপ পেতে লাগল। ফলে তোমার কর্মচারীরা আক্ষরিক অর্থে অসৎ না হলেও সুযোগ বুঝে অল্পাবিস্তর কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়তে লাগল। রন্ধ্রে রন্ধ্রে এত বেশী আধিব্যাধি ক্রমে ঢুকে গেল যার ফল এখন তোমাকেই ভোগ করতে হচ্ছে। তোমার বা তোমার কর্মচারীদের দ্বারা আর জমিদারিই বল আর প্রজার কথাই বল, কারো মঙ্গল সাধনই এখন আর সম্ভব নয়।

কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ম্যানেজার থেকে শুরু করে মায় গোমস্তা পর্যন্ত আমার কোন কর্মচারীই অসৎ নয়।

আমি কিন্তু একবারও বলিনি তারা চারিত্রিক দোষে দুষ্ট।

তবে?

মাথার ওপরে শাসনের খড়্গ না থাকলে যা হয়, ব্যস এটুকুই মাত্র বলতে চাইছি। ম্যানেজাব প্রভৃতি কর্মচারীদের শাসন করার অধিকার ছিল ঠিকই, কিন্তু প্রজা প্রতিপালন করতে গেলে যেটুকু ক্ষমতা থাকা দরকার সে ক্ষমতার আধার তুমি সে রয়ে গেলে দূরে বহুদূরে সেই পশ্চিমেব দেশে। প্রজাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাতে হ'ত ম্যানেজারবাবুকে। তিনি হয়ত কেটে ছেঁটে যেটুকুর গুরুত্ব অনুভব করতেন তোমার কাছে পেঁছে দিতেন। প্রজার সঙ্গে সম্পর্কহীন তুমি আবার বিচার বুদ্ধি দিয়ে যেটুকু গ্রহণযোগ্য মনে করতে তার ছিঁটেফোঁটা সমাধানের নির্দেশ দিতে, মিথ্যে বলেছি?

সাহেব নীরবে বন্ধুর মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

বিদ্যাসুন্দরবাবু বলিয়া চলিলেন—তোমার কর্মচারীরা ভালই জানত, জমিদারি তোমার নামে থাকলেও এখানকার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের

যাবতীয় সুখ-দুঃখ সবই কর্মচারীদের হাতের মুঠোয়। প্রজারা ধরেই নিল, তাদের অভিযোগ গুলো মাঝপথেই থেমে যায়, তোমার কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। তাই তারা দীর্ঘদিন এ মহাশ্মশানে পড়ে, মুখবুজে অসহায়ভাবে ধুঁকতে লাগল। কপাল কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া এইবার বলিলেন—মাটি ও মানুষের মিলনে প্রতিবন্ধকতা করিতেছ তোমরা, অর্থাৎ তোমার মত জমিদাররা। জমিদার ও প্রজার মধ্যে প্রীতির অভাব দেখা দিলে সেখানে মঙ্গল ত হয়ই না, বরং সর্বনাশের চূড়ান্ত হতে বাধ্য। তুমিও সে বিপদ সীমায় এসে পৌঁছেছ বন্ধু। প্রজাদের জীবন দুঃসহ যন্ত্রণায় ভরপুর, তোমার মধ্যেও নেই এতটুকুও শান্তি নেই স্বস্তির চিহ্নমাত্রও, আমি অন্ততঃ বুঝি।

তোমার সঙ্গে দেখা না হলে রূঢ় হলেও এমন বাস্তব কথা শোনার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতুম বন্ধু।

দেখ রাধামাধব, একে তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তার ওপর জমিদার। তোমার নিতান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী না বলে অন্ততঃ আমার নিজের বাড়িতে বসে তোমায় এমন কড়া কড়া কথা অবশ্যই বলতুম না। এতদিন পরে দেখা। কোথায় দু-চারটে ভাল ভাল কথা বলে—

এগুলোও ত ভাল কথাই বন্ধু। অপ্রিয় হলেও সত্য, অস্বীকার করার উপায় নেই।

দেখ রাধামাধব, হিতাকাঙ্ক্ষী জীবনে অনেকই জোটে। সুসময়ে চারদিকে গনগুন করে বেড়ায়ও অনেকে। কিন্তু প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী যেখানেই থাক,যত দূরেই থাক না কেন শুভ কামনা করবেই। প্রয়োজনে তিক্ত কথা বলতেও দ্বিধা করবে না। এই যে তুমি আমার বাড়ি কিছু সময়ের জন্য বেড়াতে এসেছ। ক্ষণিকের জন্য হলেও তুমি আমার অতিথি ত বটে। অহেতুক দু-চারটে কড়া কথা বলে তোমার মনটাকে বিষিয়ে দিয়ে কি লাভ আমার, বলতে পার? ব্যাপারটা শিষ্টাচার বহির্ভূতও ত বটে। কিন্তু একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে কথাগুলো তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া আমার প্রাথমিক কর্তব্যই বিবেচনা করেছি। তাই ত—তাঁহাকে মাঝ পথে থামাইয়া দিয়া সাহেব বলিলেন—বিদ্যাসুন্দর তুমি আমার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই না আমাকে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে উৎসাহী হচ্ছ। নইলে সৌজন্য বশতঃ দু-চারটে গদবাঁধা কথা বলে কর্তব্য সম্পাদন করতে।

ম্লান হাসিয়া বিদ্যাসুন্দর এইবার বলিলেন—রাধামাধব, তোমার জমিদারি, তোমার প্রজা, এর উন্নতি-অবনতির কথা তোমার চেয়ে ভাল কেউ বুঝবে না। তবু জীবনে চলার পথে আমাদের বহু ভ্রান্তি হয়ে থাকে। তা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছায় যা-ই হোক না কেন, ঠিক কিনা? কিন্তু সুধীজন কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে সে ভ্রান্তি সংশোধনে যারা ব্রতী হতে পারে তারাই মহৎ-উদার।

হাঁ, সংশোধনের মধ্য দিয়েই ত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটা সম্ভব বন্ধু।

আর একটা কথা তোমাকে বলব বলব করে বলে উঠতে পারি নি।

ম্লান হাসিয়া সাহেব বলিলেন—কি কথা বন্ধু ?

অদৃষ্ট বিড়ম্বিত নয়ন গাঙ্গুলির কথা বলছিলাম।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রাধামাধব বলিলেন—এটা একটা দুর্ঘটনা বিদ্যাসুন্দর ! এমনটা যে ঘটবে, স্বপ্নেও ভাবিনি কেউ !

আমি কিন্তু দুর্ঘটনা বলে ব্যাপারটা চাপা দিতে এতটুকুও উৎসাহ পাচ্ছি নে। নয়ন গাঙ্গুলির আত্মহত্যার ব্যাপারটাকে যদি দুর্ঘটনা বলে থাকে, তবে আর—

নয়ন গাঙ্গুলির অস্বাভাবিক মৃত্যু সমাজের বুকে কতখানি ছায়াপাত করিয়াছে, ব্যাপারটি ভিতরে ভিতরে কতখানি জটিল হইয়াছে সে সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিবার প্রত্যাশায় সাহেব বিদ্যাসুন্দরবাবুকে ছোট্ট একটি খোঁচা দিলেন—দেখ বিদ্যাসুন্দর, বৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলির মৃত্যুর জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। তার পরিবারকে শান্তনা দেবার ভাবা আমাদের নেই। কোন কিছুর বিনিময়েই তা পূরণ হবার নয়, ভালই জানি। কিন্তু—

এর মধ্যে আর কোন কিন্তু থাকতে পারে না বন্ধু।

তবু ধৈর্য ধরে আমার একটা কথা শোনার চেষ্টা কর বিদ্যাসুন্দর।

বল শুনি, কি বলতে চাইছ তুমি ?

নয়ন গাঙ্গুলির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারটাকে যুক্তি কষ্টিপাথরে ফেলে যদি আমরা বিচার করি কি পাব ? আমি প্রথমেই বলব, বার্ধক্যতার কর্মশক্তি গ্রাস করে ফেলেছিল। তার ওপর রোগব্যাধি তাকে অথর্ব পঙ্গু করে দিয়েছিল।

তার মত একটা বুড়ো ঘোড়াকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে যাবে কোন যুক্তিতে, এই ত ?

আমি কিন্তু ঠিক এরকম কোন মন্তব্য দাঁড় করাতে চাইছি না। তবে এটাও ত মিথ্যে নয়, একটা পরিবারকে বিনা স্বার্থে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হবে কোন যুক্তিতে ? কাজ কর, মালিককে কিছু দাও, বিনিময়ে আহার্য গ্রহণ কর, এটাই ত যুক্তি সঙ্গত।

বিদ্যাসুন্দরবাবু নীরবে সাহেবের বক্তব্য শুনতে লাগলেন।

সাহেব কয়েক মুহূর্ত নীরবে বন্ধুবর বিদ্যাসুন্দরের মনোভাব সম্বন্ধে আঁচ লইবার চেষ্টা করিয়া এইবার বলিলেন—তবে এর সঙ্গে মানবিকতার প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু মানবিকতা, দয়া-ধর্ম মানুষ কখন প্রদর্শন করে যখন অর্থের প্রাচুর্য থাকে। তুমি হয়ত জান না বন্ধু, আমার জমিদারি এখন ভাটার টানে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভাঙা তরীটি উজানে বেয়ে নিয়ে যাওয়ার মত সামর্থের নিতান্তই অভাব।

নয়ন গাঙ্গুলির জন্য তোমার মাসে আর এমন কি বিরাট অঙ্ক ব্যয় হ'ত রাধামাধব ?

নয়ন গাঙ্গুলি ত আর একা নয় বন্ধু। পাঁচ-ছ'জন অকর্মন্য বুড়ো মানুষকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেয়ার সামর্থ এখন আর আমার নেই। থাকলেই বা আমি তা

করতে যাব কোন যুক্তিতে ?

কথা কিন্তু দু'রকম—

দু' রকম ? কিসের দু'রকম কথা বললুম ?

তুমি এইমাত্র বললে, পাঁচ-ছ'জন অকর্মণ্য বুড়োমানুষকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেয়ার সামর্থের ইদানিং বড়ই অভাববোধ করছ।

হাঁ, সত্যই ত। ইদানিং আমার জমিদারির আয় যা দাঁড়িয়েছে, কারো জন্য কিছু করার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলিয়ে উঠতে পারি নে।

হাঁ, এটা অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কথাই বটে।

তবে ?

তবে তোমার পরের কথাটুকু স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি বন্ধু। ঐ যে তুমি বললে, সামর্থ থাকলেই বা করতে যাব কোন যুক্তিতে ?

সাহেব ইহার কি উত্তর দিবেন সহসা ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। অপলক চোখে বিদ্যাসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিদ্যাসুন্দর বলিয়া চলিলেন—দেখ রাধামাধব, কর্তব্য, ন্যায়-নীতি প্রভৃতি কিছু শব্দকে এখনও অভিধান থেকে কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে দেয়া হয় নি। শুধু তা-ই নয় সে বিশেষ গুণই বল আর ব্যতিকই বল, আজও কোন কোন মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে সদা জাগরূক আছে বলেই জগৎ-সংসার টিকে আছে। তার প্রতিটা কাজও অব্যাহত রয়েছে।

তোমার কথাগুলো কেমন যেন—

তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই বিদ্যাসুন্দর বলিয়া উঠিলেন- কেমন যেন তীরের ফলার মত অন্তরে আঘাত হানছে, তাই না বন্ধু ? মুখে বিষণ্ণতার ছাপ ফুটাইয়া তুলিয়া তিনি আবার বলতে লাগিলেন—দেখ রাধামাধব, আগেই বলেছি, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধু বলেই মনে করি, আর তুমিও আমায় তোমার যথার্থ হিতাকাঙ্খী মনে করতে পার। তাই তোমার মঙ্গলার্থে সঙ্গত কথা বলতে আমি এতটুকুও সংকোচবোধ ছেলেবেলার সেই দুরন্ত দিনগুলোতেও করি নি, জীবনের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আজও করব না।

সে ত নিশ্চয়ই ! সে ত নিশ্চয়ই ! নইলে তোমাকেও যে তোষামুদে চাটুকারের দলে ফেলতে হয় বন্ধু।

যথার্থই বলেছ বন্ধু। আমার কিছু বক্তব্য বলছি। দীর্ঘদিন পর তোমায় কাছে পেলুম। ভবিষ্যতে আর কোনদিন আমরা দু' বন্ধুতে এমন পাশাপাশি বসে মন খোলসা করে কথা বলার সুযোগ পাব কিনা, ঈশ্বরই জানেন। তাই দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে, আতিথ্যের নীতি অগ্রাহ্য করে তোমার মরচে পড়া মনে কিছু কথা গেঁথে দেবার চেষ্টা করছি।

বল বন্ধু। তোমার যা কিছু বক্তব্য নির্দ্বিধায় আমায় বল। আমি এতটুকুও মনক্ষুন্ন

হ'ব না, তোমার ওপর বিদ্বেষ ভাবও পোষণ করব না, কথা দিচ্ছি।

তুমি একটু আগে বললে, তোমার জমিদারির আয়ে ইদানিং ভাটা পড়েছে। খুবই সত্য কথা। আমি আজ অথর্ব পঙ্গু হয়ে ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছি। দৃষ্টি শক্তিও হারিয়ে একেবারেই অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি। রোগ-শোকে আমি অকালেই বার্ধক্যদশা প্রাপ্ত হয়েছি। এর জন্য কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি কোন ক্ষোভ, কোন অসন্তোষ প্রকাশ করিনে। বরং মাঝে মধ্যে ধন্যবাদই জানাই তাঁকে।

সে কী কথা বন্ধু। দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও? চক্ষুদ্বয় কপালে তুলিয়া সাহেব সবিস্ময়ে বলিলেন।

অবশ্যই। নইলে সমাজ দিনের পর দিন যেভাবে স্বার্থগৃধ্নু মানুষে ছেয়ে যাচ্ছে, চোখ থাকলে নীরবে দেখতে হ'ত যে বন্ধু। কথাটি সাহেবের মনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া এইবার বলিলেন—জমিদারির দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তাবার পর তুমি কিছুদিন বিদেশে ও কিছুদিন জমিদারি এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিয়েছে। ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্ম-চারীদের ওপর তোমায় নির্ভরশীল হইতে হয়েছিল। ফলে লাগাম হীনতার সুযোগে জমিদারি কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, জঞ্জালের পাহাড় গেছে জমে।

সাহেব বলিয়া উঠিলেন—সেইসব জঞ্জাল সরাতে গিয়ে যদি নয়ন গাঙ্গুলির মত দু-চারজন আত্মহত্যা করেই থাকে তবে সে দায়িত্ব কি আমাকে নিতে হবে বিদ্যাসুন্দর? অথচ তুমি সব দোষ আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নয়ন গাঙ্গুলির হয়ে সাফাই গাইছ।

চমৎকার! চমৎকার কথা বললে রাধামাধব।

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি বন্ধু।

আচ্ছা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব রাধামাধব?

আমি বলেইছি, তোমার যা কিছু বক্তব্য নির্দ্বিধায় আমার কাছে ব্যক্ত করতে পার।

তুমি আমার কাছে বন্ধুত্বের পরিচয় নিয়ে এসেচ বলেই প্রসঙ্গটা উল্লেখ করতে ভরসা পাচ্ছি। অবশ্য প্রজা আর জমিদারের সম্পর্কের কথা যদি বল তবু এ-প্রসঙ্গে কথা বলা আমার পক্ষে অশোভন হ'ত না। তবে আমারই বাড়িতে বসে এধরনের অপ্রিয় আলোচনা—

অপ্রিয় হলেও এর সত্যতাও আর অস্বীকার করা যাবে না। বিদ্যাসুন্দরবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, অস্বীকার করার মত মানসিকতাও তোমার নেই, আমার ভালই জানা আছে বন্ধু। ছেলেবেলায় আমরা উভয়ে আন্তরিকভাবেই মেলামেশা করেছিলাম। তোমার মনের খবর আমার অজানা নয় বন্ধু। সেদিনের সেই রাধা-মাধবের স্বার্থপরতায় নয়ন গাঙ্গুলির মত একজন নিষ্ঠাবান সদাশয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মৃত্যু হতে পারে, বিশ্বাস করতেও মনের দিক থেকে এতটুকুও উৎসাহ পাচ্ছিনে বন্ধু! এক নাগাড়ে এতগুলি কথা বলিয়া অকালবৃদ্ধ বিদ্যাসুন্দর রীতিমত হাঁফাইতে লাগিলেন। সাহেবের বুঝিতে অসুবিধা হইল না তাঁর অভিন্ন হৃদয় বাল্য বন্ধুটি

ভিতরে ভিতরে উত্তেজনায় দগ্ধ হইতেছেন। আসলে তিনিও মনে মনে ইহাই চাহিতেছেন। নয়ন গাঙ্গুলির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া যে একটি চাপা উত্তেজনার জোয়ার বহিয়া চলিতেছে তাহার তীব্রতা কতখানি। তাই মনের কথা গোপন রাখিয়া প্রসঙ্গটিকে চাপা দিতে তিলমাত্রও প্রয়াসী হইলেন না। সত্য বলিতে কি সুযোগমত তাঁহাকে উসকাইয়া দিয়া মনের গোপন কন্দর হইতে কথা টানিয়া বাহির করিতেই তাঁহার উৎসাহের আধিক্য লক্ষিত হইল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে একটু শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিদ্যাসুন্দরবাবু এইবার বলিলেন—আচ্ছা রাধামাধব, নয়ন গাঙ্গুলি তোমার জমিদারি সেরেস্তায় কতদিন চাকরি করেছিল, বলত ?

আমি ত এই সেদিন জমিদারি উত্তরাধিকার সূত্রে হাতে পেয়েছি। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের আমল থেকেই ত তিনি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

বিদ্যাসুন্দরবাবু ম্লান হাসিলেন। মুখের হাসিটুকু বজায় রাখিয়াই তিনি বলিলেন—তবে দেখা যাচ্ছে, ওকে কাজে বহাল করেছিলেন তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব, তুমি নও, এই ত ?

হাঁ, ঠিকই।

তবু কতদিন তোমাদের জমিদারির সেবা করছেন, বলতে পার ?

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—কেন পারব না ? আমার কোন কর্মচারী কতদিন চাকুরিতে নিযুক্ত এটুকু না জানা '

সে কথাটাই ত জানতে চাইছি বন্ধু। নয়ন গাংগুলি কত বছর কর্মে নিযুক্ত ছিলেন ?

কম করেও চল্লিশ বছর ত হবেই।

চল্লিশ বছরও যদি হয়, সময়টা কিন্তু নেহাৎ কম নয় বন্ধু। আর একটা কথা, ভদ্রলোক যদি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ না করতেন, অর্থাৎ যদি আত্মহত্যার পথ বেছে না নিতেন তবে আর কতদিন তিনি জীবিত থাকতেন বলে মনে কর ?

প্রশ্নটা একটু কেমন হয়ে গেল না বন্ধু ? কারো জন্ম মৃত্যু ত আর মানুষের হাতে নয়। কার আয়ু কত দিন, এক বিধাতা পুরুষই বলতে পারেন।

খুবই সত্য কথা। তবু কারো কারো শারীরিক অবস্থা দেখে মোটামুটি একটা ধারণাও যে কোন কোন ক্ষেত্রে করা যায়, অস্বীকার করা যায় না।

সে—কথাই যদি বল, আমি বলব, নয়ন গাঙ্গুলিকে চারদিক থেকে আধিব্যাধি যেমন জেঁকে ধরেছিল তাতে করে বড়জোর বছর পাঁচেক হয়ত টিঁকে থাকত।

যে লোকটি এক নাগাড়ে চল্লিশ বছরের উর্ধে নিষ্ঠার সঙ্গে তোমাদের জমিদারির সেবা করে আজ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলল ওকে কি মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দিলেই চলছিল না রাধামাধব ? আজ মানবিকতার অপমৃত্যু ঘটেছে তোমার। আত্মস্বার্থে বিভোর হয়ে তুমি যদি বিবেক-চৈতন্য হারিয়ে না বসতে তবে কর্মক্ষমতা রহিত নয়ন

গাঙ্গুলির বেঁচে থাকার অধিকারটুকু তুমি কিছুতেই এমন নির্মম-নিষ্ঠুর ভাবে কেড়ে নিতে না। ওর পাঁচ-পাঁচটি বছরের আয়ু কেটে ছেঁটে কমিয়ে অবশ্যই দিতে না রাধামাধব।

সাহেব নিষ্পলক চোখে বিদ্যাসুন্দরবাবুর মুখের কাঠিন্যটুকুর পরিমাপ করিতে লাগিলেন।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিদ্যাসুন্দরবাবু এইবার ক্ষীণকণ্ঠে, প্রায় স্বগতোক্তি করিলেন—রাধামাধব, এই জগৎ-সংসারের গণ্ডী পেরিয়েও এক আদালত আছে। প্রত্যেক মানুষকে সে—কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হবেই। আজ না হোক কাল। ক্ষমতা ও চাতুর্যের বর্ম পরে ইহলোকবাসীকে ফাঁকি দিতে পারলেও শেষ-বিচারের দিন কি জবাব দেবে আগেভাগে ঠিক করে রেখো। আমাদের সে বিশেষ দিনটি তেমন দূরে নয়, বিস্মিত হোয়ো না যেন। নয়ন গাঙ্গুলির অতৃপ্ত আত্মা তোমায় কিছুতেই রক্ষা করবে না।

সাহেব বিষণ্ণ মনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিদায়ী সূর্যটি পশ্চিম আকাশের গায়ে শেষ রক্তিম আভাটুক নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া বিদায় লইবার জন্য উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে।

সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া সশব্দে আড়মোড়া ভাঙ্গিলেন। কোটের পকেট হইতে দুইটি দশটাকাব নোট বাহির করিয়া নীরবে বিদ্যাসুন্দরের হাতে দিলেন। বিদ্যাসুন্দর ব্যাগ্রতার সহিত বার কয়েক নোট দুইটি হাতাইতে লাগিলেন।

সাহেব বলিলেন—'কটা টাকা তোমায় দুধ খাওয়ার জন্য দিলাম বন্ধু।'

বিদ্যাসুন্দর নিদারুণ বিতৃষ্ণার সহিত নোট দুইটি রাধামাধবের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—আমার জন্য ভাবতে হবে না বন্ধু! ক'দিন আর বাঁচব। সব গেলেও চালের টিন ক'টা ত সম্বল রইলই। ওগুলো ফুরোবার আগেই আমার প্রদীপে ছিঁটেফোঁটা যেটুকু তেল আছে, ফুরিয়ে যাবে। টাকা ক'টা যদি নয়ন গাঙ্গুলিকে দিতে হতভাগাটা আরও দুটো মাস পৃথিবীতে টিকে যেত।

বিদ্যাসুন্দরবাবুর কথাগুলি সুতীক্ষ্ম ফলার মত সাহেবের অস্থি-মাংস-মজ্জা ভেদ করিয়া সরাসরি ফুসফুসে গিয়া আঘাত হানিল। তিনি বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীর মন্থর পায়ে বাড়ির বাহিরে আসিলেন।

এগার

মিঃ আর. এম. রে আবলা বিলাসব্যসনের মধ্য দিয়াই জীবন কাটাইয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন দুর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদারনন্দন। বাল্যে ও কৈশোরে সহাধ্যায়ীদের নিকট হইতে যথেষ্ট সমাদর-সমীহ লাভ করিয়াছেন। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে তোষামোদ শব্দটির ব্যবহারই যথার্থ বিবেচিত হইবে। কাহারও প্রতি কটূক্তি না করিলেও অপর কেহ অন্ততঃ তাহাকে কটু কথা শোনাইতে ইতস্ততঃ করিত। চরম সত্যের অবতারণা করিয়া কোনরকম অপ্রিয় উক্তি করিতেও যে কেহ কয়েক মুহূর্তের

জন্য হইলেও অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া লইত। ইহার পশ্চাতে অন্য আর যেই কারণই থাকুক না কেন তাঁহার পিতার প্রতাপ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই যে মুখ্য কারণ ইহা মুখ ফুটিয়া বলিবার অবকাশ রাখে না। কর্ম-জীবনেও বিলাত হইতে ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া পশ্চিমের দেশে রীতিমত দাপটের সহিতই দিনাতিপাত করিতেন। একে ব্যারিস্টারি করিয়া দুই হাতে টাকা লুটিয়াছেন। তাহার উপরে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমিদারি হইতেও আয় নেহাৎ কম হইত না। স্ত্রী আর একটিমাত্র কন্যা আলেখ্য তাঁহার পোষ্য। অতএব তাঁহার চলার পথ আজন্ম সরল রেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এতটুক বাঁক লইবার সামান্যতম অবকাশও মুহূর্তের জন্য প্রতিভাত হয় নাই। আত্মজনের বিয়োগ-ব্যথা ছাড়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার অবকাশও তাঁহার জীবনে দেখা দেয় নাই। কিন্তু আজিকার দিনটি তাঁহার বাহাত্তর বছরের জীবনে বিশেষ দিন হিসাবে চিহ্নিত হইল। একজন কর্মচারীর মৃত্যু যে তাহার অন্নদাতার মনে এমন গভীব ছায়াপাত করিতে পারে স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই মিঃ রে-সাহেব। সামান্য তেরটি টাকা সে একটি মানুষের বাঁচার অধিকার কাড়িয়া লইতে পারে তাহাও আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন তিনি। সব কিছুই যেন দৈববলে ঘটিয়া গেল! বাজীকরের জাদুকাঠির ইঙ্গিতে যেমন অসম্ভব সম্ভাবনাময় হইয়া ওঠে নয়ন গাঙ্গুলির আকস্মিক মৃত্যুটিও যেন ঠিক তেমনি কিছু একটি ব্যাপার। নইলে এতদিন পর ম্যানেজার আচমকা এমন জরুরী তলব পাঠাইবেন কেন কেনই বা বিশেষ অনুরোধ করিয়া বার্তা পাঠাইবেন? তাহার পরও কথা থাকিয়া যায়। কন্যা আলেখ্যর নিকট হইতে যে আচরণ প্রত্যাশা করা যায় না সে তাহাই করিয়া বসিল। ইন্দুদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া তাহার বাবাকে গ্রামের বাড়িতে আসিবার প্রস্তুতি লইতে দেখিয়া সে রীতিমত জেদ ধরিল তাঁহার সহিত আসিয়া বেড়াইয়া যাইবে। শহরের জাঁকজমক ও কর্মচাঞ্চল্য হইতে দূরে উন্মুক্ত গ্রাম্য পরিবেশের নির্জনতায় কিছুদিন কাটাইয়া স্বস্তি লাভ করিতে আগ্রহী। রে-সাহেব কিন্তু ঠিক ইহার উল্টোটি ভাবিয়াছিলেন। আলেখ্য কিছুতেই ইন্দু ও কমলাকিরণ প্রভৃতিকে ছাড়িয়া অজ পাড়াগাঁয়ে আসিতে অবশ্যই সম্মত হইবে না। আর এইখানে আসিয়াই সে জমিদারির কাজকর্মকে নতুন করিয়া ঢালিয়া সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। পূর্ণ উদ্যমে কাজে মাতিয়াও গেল। কিন্তু কার্যতঃ কি দেখা গেল? প্রথম পদক্ষেপেই জমিদারির ব্যয়ভার কমাইবার অজুহাতে, জঞ্জাল পরিষ্কারের নামে নয়ন গাঙ্গুলির মৃত্যুর মধ্যে দিয়া তাহাকে অভাবনীয় একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হইতে হইল। এ ব্যাপারটি যে তাহার মনেও বিশেষ রেখাপাত করিয়াছে তাহা তাহার উক্তির মধ্য দিয়া পরিষ্কার পরিস্ফুট হইয়াছে। মুহূর্তের জন্য হইলেও সে হতাশ মনে ভাবিয়াছে, সংসার কেবলমাত্র একটি দোকান-ঘর নয়। লাভ-লোকসান বা হিসেব নিকেশের সুতোবাঁধা লাল খাতাটির কালো অক্ষরগুলোর মধ্যেই সংসারের সব কিছু আবদ্ধ নয়। এইখানে কেহই অবাঞ্ছিত নয়। নিতান্ত অক্ষমেরও বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে।—কাজ

করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে বলিয়া তাহার জীবন ধারণের দাবীও অস্বীকার করা যায় না।

পর মুহূর্তেই তাহার মধ্যে বিপরীত ভাবনারও উদয় হইয়াছিল। তাহার পিতা ব্যাপারটিতে কতখানি মর্মাহত হইবেন একমাত্র এই ভাবনাটুকুই তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছিল। কারণ তাহার পিতার দুর্বলতার প্রতি তাহার তিলমাত্র শ্রদ্ধাও ছিল না। এই পাঠ সে তাহার স্বর্গতা মায়ের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিল। তাহার বাবা অপরের অন্যায়কে কোনদিনই তিনি বড় করিয়া দেখিয়া কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাঁহার চিত্তদৌর্বল্যের সুযোগ লইয়া অনেকেই তাঁহাকে ঠকাইয়াছে। কিন্তু আলেখ্য যদি সুযোগ সন্ধানী দিগের গতি স্তব্ধ করিয়া দিতে একটু আধটু কাঠিন্য প্রকাশ করিয়া থাকে তবে অন্যায়টা কোথায়? সে যার পর নাই অবাক হইল, যখন দেখিল, তাহার পিতা সদ্যোমৃত নয়ন গাঙ্গুলির মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি কোনরকম উষ্মা প্রকাশ করিলেন না, কন্যার প্রতি একটি কঠোর বাক্যও প্রয়োগ করিলেন না। তাঁহার ব্যথিত নীরবতা আলেখ্যকে কম ভাবিত করিল না। একদিন ব্রজবাবুকে মনের গোপন আর্তির কথা অশ্রুরুদ্ধ ভগ্নস্বরে ব্যক্ত করিয়াই ফেলিয়াছিল—আপনাদের দেশে এসেছিলাম থাকতে কিন্তু এর পরে এখানে মুখ দেখাতেও পারব না। আবার তাহার পিতার কাছেও একই স্বরে নিজের কৃত অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিল—আমিও এক শ' বার স্বীকার করছি বাবা, আমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি, আমায় তিনি অতবড় শাস্তি দিয়ে যাবেন! নয়ন গাঙ্গুলি আমার চরম শাস্তি দিয়ে গেলেন। জগতে নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতে যাইয়া যে এমন মর্মপীড়া এত দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় সে প্রথম উপলব্ধি করিল।

যাহাই হউক বাল্যবন্ধু বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্যের নিকট হইতে এতবড় আঘাত পাইয়া সাহেব হৃতোদ্যম হইয়া পড়িলেন। জীবনে এই প্রথম এতবড় ধাক্কা, এতবড় অপমান তাঁহাকে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইয়াছে। নয়ন গাঙ্গুলির মৃত্যুর পর প্রজাদের মধ্যে যে চাপা ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা স্বাভাবিক ভাবে নির্বাপিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি সাব্যস্ত করিয়া ছিলেন। কিন্তু বাল্যবন্ধু আজ তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছেন। নয়ন-গাঙ্গুলির মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া সমাজের বুকে বিষ-ক্রিয়া যে কত খানি মারাত্মক রূপে প্রতিভাত হইতে পারে সেই সম্পর্কে তিনি যতখানি উদাসীন ছিলেন, এখন ততোধিক সচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মত লোককেও এতবড় আঘাত, এতখানি অপমান লাঞ্ছনা নীরবে হজম করিয়া অবনত মস্তকে সেই বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

বাড়ি ফিরিয়া রে-সাহেব বিষন্ন মনে আরাম কেদারায় বসিয়া রহিলেন। কাহারো সহিত কোন কথা বলিলেন না। আলেখ্য প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বার কয়েক তাঁহার ঘরে আসিল। পিতার গাম্ভীর্যটুকু তাহার নজর এড়াইল না। প্রথমে ভাবিয়াছিল,

দীর্ঘ পথ পায়ে-হাঁটিয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া বুঝি বা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইলেই ক্লান্তি অপনোদন হইয়া যাইবে। পুনরায় স্বাভাবিকতা ফিরিয়া পাইবেন। তাহার পরও আলেখ্য তাঁহার কাছে আসিয়াছে, কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। রাত্রে খাবার টেবিলেও তিনি অনুপস্থিত রহিলেন। আলেখ্য ডাকিতে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখাইয়া তিনি বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িলেন। আলেখ্য ও ইন্দুর বিশেষ অনুরোধও পীড়াপীড়ি এড়াইতে না পারিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও রে-সাহেব মাত্র এক গ্লাস গরম দুধ পান করিলেন। ব্যস কোন কথা কহিলেন না। শুইয়া পড়িলেন।

সকাল হইল। রে-সাহেব সেইদিন অনেক বেলা পর্যন্ত শয্যা আশ্রয় করিয়া রহিলেন। নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে তাঁহাকে নির্ঘুম রাত্রি কাটাইতে হইয়াছে। আলেখ্য নিজে হাতে চা করিয়া বাবাকে দিয়া গেল। চায়ের কাপটি টেবিলে রাখিয়া বার কয়েক ডাকিয়া তাঁহাকে সচেতন করিয়া গেল। তারও বেশ কয়েক মিনিট পর তিনি শয্যা ত্যাগ করিলেন। চটি জোড়া পায়ে গলাইয়া নীরবে সম্মুখস্থ বাগানের দিকে হাঁটিতে লাগিলেন। আলেখ্য তাহার ঘরে আসিয়া দেখিল, শয্যা শূন্য চায়ের কাপ যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা কাল পরে সাহেব আবার নিজের ঘরে ফিরিলেন। আরাম কেদারাটি আশ্রয় করিয়া বিষন্ন মুখে বসিয়া রহিলেন। খোলা-জানালা দিয়া অদূরবর্তী নারিকেল গাছটির দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। দৃষ্টি তাঁহার উদাস নিস্পৃহ।

আলেখ্য ধীর মন্থর পায়ে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নীরবে পিতার বিষন্ন মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এক সময় চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বাবা।

সাহেব ঘাড় ঘুরাইয়া তাহার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ।

আলেখ্য কহিল—বাবা, জমিদারিও তোমার—অন্ততঃ তুমি যতদিন জীবিত আছ, আমার মাথাব্যথা থাকারও কথা নয়। এবং সার্বিক মালিকানা তোমারই, আমার নয়। মালিকানা কোনদিন আমার ওপর বর্তাবে কিনা তাও ভবিষ্যতের কথা।

সাহেব তেমনি উদাসীন নিস্পৃহ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

পিতার এই নীরবতাকেই আলেখ্যর সর্বাপেক্ষা বেশী ভয়। ইহার তাৎপর্য আর কেহ বুঝিতে না পারিলেও আলেখ্য ঠিকই বুঝিতে পারিল। তাহার পিতার মনোভাব বুঝিয়াও নিজেকে সংযত রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। আগের মতই বিষন্ন মুখে বলিল—বাবা, আগে যেরকম চলে আসছিল এখনও ঠিক তেমনি সব কিছু চলুক, এটাই কি তোমার আন্তরিক ইচ্ছা?

সাহেব নীরব দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন।

আলেখ্য পিতার নীরবতা ভংগ করিতে ব্যর্থ হইয়া এইবার একটু গল্প চড়াইল— বাবা তোমার হাসিমাখা কথা, সাদা সিদে সহজ-সরল আচরণে অতীতেও অনেকে সুযোগ নিয়ে তোমায় বঞ্চিত করেছে, এখনও যার পর নাই প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। এসব বৈষয়িক ব্যাপার তুমি কোনদিনই বুঝিতে পারনি চেষ্টাও করনি বুঝতে। আমি কিন্তু আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

আলেখ্য ভাবিয়া ছিল এইবার অন্ততঃ তাহার পিতা নীরবতা ভংগ করিবেন। কিন্তু হায়! সাহেব তথাপি টু-শব্দটি পর্যন্ত করিলেন না কেবল তাঁহার ফুসফুস নিঙাড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। এই অভিযোগেরও কোন উত্তর দিলেন না। তেমনি মৌণ হইয়া আবার জানালা দিয়া বাহিরের খোলা আকাশের গায়ে দৃষ্টি নিবন্ধ করিলেন।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, ড্রইং রুমে কমলকিরণ আলেখ্যর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ম্যানেজার ব্রজবাবুও উপস্থিত হইয়াছেন। জমিদারি পরিদর্শন করিতে যাইবেন। রাস্তাঘাট সম্বন্ধে ভাল জানা না থাকলে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবার নয়। তাই এই তোরজোর।

আলেখ্য যেমন আসিয়াছিল তেমনি ধীর মন্থর গতিতে পিতার ঘর হইতে বাহির হইয়া ড্রইং রুমের উদ্দেশে পা বাড়াইল।

কমলকিরণ একটি অসমাপ্ত ম্যাপের দিকে গভীর মনযোগ সহকারে চাহিয়া আছে। ব্রজবাবুর দৃষ্টিও ম্যাপের উপর নিবন্ধ, স্থির।

বিষন্নমুখে আলেখ্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার উপস্থিতি অনুমান করিয়া কমলকিরণ ম্যাপের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়াই কহিল—কাকাবাবু কিছু বললেন?

আলেখ্য গম্ভীর স্বরে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল—না।

কাল বিদ্যাসুন্দরবাবুর সংগে এমন কি কথা হতে পারে যার ফলে তার ওনার মধ্যে আকস্মিক ভাবান্তর ঘটল? অমরনাথবাবুর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে কোন আঁচ নিয়ে এসেছেন কিনা, তাই বা কে জানে?

আলেখ্য তেমনি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া শিষ্টাচার বজায় রাখিল—কিছুই বুঝতে পারলুম না।

ব্রাহ্মণগুলো সমাজটাকে একেবারে—কমলকিরণ কথাটি শেষ করিল না। অর্দ্ধ-পথেই লাগাম টানিয়া ধরিল। ব্রজবাবুর দিকে চোখ পড়িতেই আপনা হইতেই তাহার জিভ যেন অকস্মাৎ আড়ষ্ট হইয়া আসিল।

আলেখ্য চেয়ার টানিয়া বসিল। ভগ্ন-হৃদয়ে কমলকিরণের উৎসাহে জলসিঞ্চন করিয়া যাইতে লাগিল। কমলকিরণের উৎসাহের অবধি নাই। ব্রজবাবুকে একের পর এক প্রশ্ন করিয়া রে-সাহেবের জমিদারি এলাকার প্রতিটি প্রান্তরের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে বিষদ বিবরণ ম্যাপের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে লাগিল।

এইদিকে ইন্দু পড়িল মহাফাঁপড়ে। সে একবার রে-সাহেবের ঘরে উঁকি মারিল। তাহাকে গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চৌকাঠ হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছে। ড্রইং-রুমে আলেখ্য তাহার দাদার সহিত জমিদারির ভবিষ্যৎ উন্নতিতে আত্মমগ্ন। এক-আধবার সে নীরবে তাহাদের টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়ায় নাই তাহাও নহে। সেইখানে তাহার উপস্থিতির আবশ্যকতা বোধ করিল না। অনন্যোপায় হইয়া সে সঙ্গীর অভাবে বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া একাকী ঘুরিয়া বেড়াইয়া সময় কাটাইবার চেষ্টায় ব্রতী হইল। এমনি সময়ে দেখিতে পাইল অমরনাথ তাহাদের বাটীর দিকে আসিতেছে। তাহার কাঁধে খদ্দরের একটি সাইডব্যাগ। সে গুটি গুটি তাহার দিকে আগাইয়া গেল। অমরনাথ তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে কিনা, বুঝিতে পারিল না। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল অমরনাথ বুঝি তাহাদের বাটীই আসিতেছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাহার ভুল ভাঙিয়া গেল। সামনের প্রাচীন বটগাছটির গা-ঘেঁষিয়া যে রাস্তাটি ডান দিকে নামিয়া গিয়াছে অমরনাথ সেই রাস্তা ধরিল। ইন্দু লম্বা লম্বা পায়ে উভয়ের মধ্যেকার ব্যবধান কিছুটা কমাইয়া লইয়া চড়া গলায় উচ্চারণ করিল—অমরনাথবাবু! অমরনাথবাবু!

অমরনাথ ঘাড় ঘুরাইয়া তাকাইল। ইন্দুকে দেখিয়া মুচকি হাসিল। ইতিমধ্যে ইন্দু লম্বা লম্বা পায়ে তাহার মুখোমুখি যাইয়া দাঁড়াইল। অমরনাথ মুখের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিয়া উঠিল—কি ব্যাপার, মনিং-ওয়াক সারছেন বুঝি?

ইন্দু সরষে হাসিয়া বলিল— হাসালেন মশায়!

কেন? এর মধ্যে আবার হাসির কি দেখলেন ইন্দুদেবী?

হাসবো না! আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন ত সূর্যটা গুটিগুটি কতটা ওপরে উঠে গেছে। এত বেলায় কেউ মর্নিং-ওয়াকে বেরয়। আপনারা শহুরে মানুষ। সেখানে ত অনেক দেরীতে সকাল হয় শুনেছি। সূর্য্যও নিশ্চয়ই অনেক দেরী করেই ওঠে। তার ওপর আপনাদের মত ধনীর দুলালীরা হয়ত দশটার আগে শয্যা থেকেই নামে না, মিথ্যে বলেছি?

বিদ্রূপ করছেন নাকি অমরনাথবাবু?

বিদ্রূপ? কই, আমার কথায় তেমন কোন আভাষ আছে বলে আমি অন্ততঃ বুঝছি না। হাসিয়া বলিল—যাক, বলুন ত এই সাত সকালে কোথায় চলেছেন?

কোথাও না। হারা উদ্দেশ্যে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কেন? আপনার বান্ধবীটি কোথায়? বাড়ি নেই বুঝি?

হাঁ, বাড়িতেই রয়েছে।

তিনি বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও তার বান্ধবী একাকীত্ববোধ করছেন, ব্যাপারটা কেমন মনে হচ্ছে না?

মনে হলেও আমার কিছু করার নেই। এত বড় একটা জমিদারির দায়িত্ব যার

মাথার ওপরে তার পক্ষে বান্ধবীকে সর্বদা সম্প্রদান করা ত আর সম্ভব নয় অমরনাথবাবু। তাই মাঝে মধ্যে একটু আধটু—মাঝ পথে থামিয়া গিয়া বলিল—কিন্তু আপনিই বা এমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছেন?

উত্তরের ঐ কর্মকার পাড়ায় একবারটি যাব ভাবছি। সাত সকালে কর্মকার পাড়ায় এমন কি কর্মের তাগিদ যে এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছেন?

কাজটা যে জরুরী আশা করি আমার ব্যস্ততা দেখে সহজেই অনুমান করতে পারছেন?

হাঁ, এটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি অন্তত: আমার আছে অমরনাথবাবু। যাক, কোথায় চলেছেন, দেশোদ্ধারের কাজে বুঝি?

আমার কাজের দ্বারা দেশোদ্ধার কতটুকু হচ্ছে, আর ভবিষ্যতেই বা কতটুকু হবে জানা নেই। তার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি যেটুকু আছে তার সাহায্যে এটুকু অন্তত: বুঝতে পারছি মহাত্মাজী এক সুমহান কর্ম-যজ্ঞে হাত দিয়েছেন। আর আমি? আমি কেবলমাত্র সমুদ্রের তীরে পেঁছিতে পেরেছি। সমুদ্রের গভীরে পেঁছিনো ত দূরের কথা, জল পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারি নি এখনো। মুচকি হাসিয়া ইন্দু তাহার সহিত পা-মিলাইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল—অন্য কেউ হলে হয়ত আপনার এ মাত্রাতিরিক্ত বিণয়ের মধ্যে অহংকারের গন্ধ খোঁজার চেষ্টা করত অমরনাথবাবু।

অমরনাথ সরষে হাসিয়া বলিয়া উঠিল—অহংকার! সত্যি আপনি খুবই রসিক ইন্দুদেবী! মেয়েদের মধ্যে এগুণটা সচরাচর দেখা যায় না।

ইন্দু সবিস্ময়ে বলিল—রসিক? এর মধ্যে আবার রসিকতা কোথায় পেলেন মশাই!

রসিকতা নয়? আমার মধ্যে এমন কি অমূল্য সম্পদ দেখলেন, যার ফলে অহংকার প্রকাশ পেতে পারে?

ইন্দু প্রায় স্বগতোক্তি করিল—অহংকার হীনতার অহংকারটুকুর জন্যই আপনি সহজেই মানুষের মন জয় করে নিতে পারেন। এ অনন্য সাধারণ গুণটুকুই আপনাকে করেছে উদার-মহৎ!

ইন্দুর কথাগুলি অমরনাথ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কেবল এইটুকুই বুঝিল, ইন্দু ঠোঁট নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে কিছু যেন বলিল। অমরনাথ হাসিয়া বলল—যার উদ্দেশ্যে বলছেন সে যদি শুনতেই না পায়, কিছু বুঝতেই না পারে তবে যে পুরো প্রচেষ্টাটাই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে ইন্দু দেবী!

ইন্দু মুহূর্তের মধ্যে বক্তব্যকে অন্য পথে পরিচালিত করিয়া দিল—বলছি যে, আপনাকে জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় চলেছেন। তার উত্তর না দিয়া কেবল ধানাই-পানাই শুরু করে দিলেন অমরনাথবাবু।

অমরনাথ হাসির স্বর অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় চড়াইয়া দিয়া কহিলেন—ও, এই কথা। তাই বলুন! বলছি তবে শুনুন, কামার-পাড়ায় চলেছি, একটু আগেই ত

বললাম। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কেন, এই ত? কলকাতা থেকে কয়েকটা অম্বর চরকা আনিয়েছি। চাষবাসের সময় দা কাস্তে প্রভৃতি তৈরীও মেরামতির কাজ থাকে, পেট চলে যায় কোন রকমে। কিন্তু বাকী পাঁচ-ছ মাস হাত গুটিয়ে কাটিয়ে দিতে হয়।. রোজগার নেই, পেট শুনবে কেন? তাই ধনুকের দ্বিতীয় ছিলার কাজ করবে ঐ চরকাগুলো।

টাকা? চরকা কেনার জন্য ত টাকা কম খরচ হয়নি অমরনাথবাবু? টাকা যোগালেন কে?

বিশেষ কোন ব্যক্তি বা সংস্থা একা নয়। বহুজনের আন্তরিকতার ফসল ঐ চরকা-গুলো। চাঁদা তুলে অসম্ভবকে সম্ভবনাময় করা হয়েছে ইন্দুদেবী।

ইন্দু তাহার কথায় স্তম্ভিত হইয়া নির্বাক চাহনি মেলিয়া গোগ্রাসে কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। অমরনাথ বলিল—একটা কথা কি জানেন ইন্দুদেবী?

ইন্দু চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ আঁকিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল।

ইন্দুকে কিছু বলিতে না দিয়াই অমরনাথ বলিতে লাগিল কথা হচ্ছে, দেশের লোকের কাছে কেবলমাত্র বিলেতি জিনিস বর্জনের বুলি আওড়ালেই ত চলবে না। তাদের পেটের যোগাড় করে দেয়াও ত—

অমরনাথকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই ইন্দু বলিয়া উঠিল আপনারা দেখছি দেশের লোকের মুখে অন্ন তুলে দেয়ার ইজারাও নিয়েছেন অমরনাথবাবু।

আপনি যতই পরিহাস করুন না কেন, এ-কাজ কিন্তু আপনার আমার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে, অস্বীকার করতে পারেন? অশিক্ষার অন্ধকারে যারা দিনের পর দিন ভুগছে, অনাহার আর অর্ধাহার যাদের নিত্যসঙ্গী, অচিকিৎসায় মৃত্যু যাদের জন্মলব্ধ অভিশাপের মধ্যে পড়ে, তাদের কি গতি হবে একবার ভেবে দেখেছেন কি? স্বার্থগৃধ্নু বেনিয়া সরকার শাসনের নামে অপশাসন আর বল্গাহীন শোষণকেই যেখানে কর্তব্য বলে গণ্য করে, জমিদার যেখানে নিয়মিত খাজনা আদায় করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। প্রজাদের সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, সবকিছু দেখে বুঝেও মুখ ঘুরিয়ে থাকেন সে-ক্ষেত্রে কাউকে না কাউকে ত এগিয়ে আসতেই হবে।

তাই বুঝি আপনি—

হাঁ, অবশ্যই মনে করতে পারেন আমি স্বেচ্ছায় নিঃস্বার্থ এ সেবাব্রত গ্রহণ করেছি। তাই বলে ভুলেও মনে করবেন না যে, আমার দ্বারা প্রজাদের দুঃখ-যন্ত্রণা সম্পূর্ণরূপে মোচন করা সম্ভব। সাধ্যমত চেষ্টা করছি—

সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে—

ভুল! সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা অন্তরে পোষণ করে আপনারা হয়ত অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরছেন ইন্দুদেবী। যশ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি কোন কিছুর মোহই আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি, কোনদিন পারবেও না আশা করি। নিছক প্রাণের টানেই, সহমর্মিতার দুর্বার আকর্ষণেই উদ্ভ্রান্তের মত ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসি, ছুটে যাই অশিক্ষিত,

উপোষী অর্ধনগ্ন মানুষগুলোর কাছে। যাদের কাছ থেকে কিছু চাওয়ার তাগিদ নেই, আছে শুধুমাত্র নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার অত্যুগ্র আগ্রহ। আমার সাধ অনেক, সাধ্য কিন্তু খুবই সীমিত। নিদারুণ বিপদের মুখেও পুকুরের শ্যাওলার মত থেকে যাই না। অন্তহীন মনোবলটুকু সম্বল করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি পথের বাধা দ'পাশে সরিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবার।

তারপর ?

বুঝলুম না ঠিক।

কিন্তু এ চলারও ত একদিন শেষ হবে, পরিণতি বলে একটা কথা থেকে যায় অমরনাথবাবু। তারপর ? ম্লান হাসিয়া অমরনাথ বলিল - আশ্চর্য প্রশ্ন করলেন ইন্দুদেবী! যে ভালভাবে কাজে হাতই দিতে পারল না, তার পক্ষে পরিণতির কথা চিন্তা করা কি করে সম্ভব, বলুন ত ?

ঠিক আছে। আপনাদের কর্ম-যজ্ঞের কথাই বলুন শুনি।

আয়োজন খুবই সামান্য বলে আবার একে কর্ম-যজ্ঞ বলে বিদ্রূপ করছেন না-ত ইন্দুদেবী ?

ইন্দু স্বাভাবিক স্বরে হাসিয়া বলিল—কথা বললেই যদি তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মনে করেন, তবে ত আপনার সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল দেখছি অমরনাথবাবু! আমি সাদা মনে জানতে চাইছি, গ্রামের চাষী, মজুর, জেলে, জোলা প্রভৃতির মঙ্গলার্থে আপনারা কি কি কাজে হাত দিয়েছেন ?

ঐ যে বললুম, কলকাতা থেকে কিছু চরকা আনিয়েছি। ক'দিন আগে কিছু, কিছু তাঁত বসিয়েছি। ভালই চলছে। এছাড়া রেশম-কীটের চাষও মৌমাছি পালনের পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছে। এর জন্য ত প্রচুর টাকা দরকার অমরনাথবাবু, কোথায় পাবেন ?

হাঁ, টাকা ত দরকারই। দেখা যাক, কোত্থেকে কি হয়।

ক্ষণিক ইতস্ততের পর ইন্দু বলিল, অমরনাথবাবু, আপনাদের কাজ সম্বন্ধে আমার সুস্পষ্ট ধারণা এতদিন ছিল না। দেশের কোথায় কি ঘটছে, ভাল কি মন্দ কোন খবরই আমি রাখি না, আগেও তেমন উৎসাহ কোনদিন ছিল না। ধরতে গেলে অন্ধকারেই ছিলুম। খবরের কাগজ যে ধরতুম না তা-ও নয়। সত্যি বলতে কি, রাজনীতির কচকচানিতে তেমন আগ্রহ কোনদিনই আমার ছিল না। যদিও ব্যাপারটা লজ্জারই বটে। আমার এতদিন বিশ্বাস ছিল, রাজনীতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অর্থ অহেতুক নিজেকে উৎকণ্ঠার মধ্যে জড়িয়ে ফেলা।

কিন্তু আপনার সঙ্গে দু'-তিনদিন কথা বলে এটুকু অন্ততঃ বুঝতে পেরেছি আপনি ভেতরে ভেতরে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, ছন্নছাড়া লোকগুলোকেই বেশী পছন্দ করেন।

ইন্দু আকস্মিক লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া

লইয়া বলিল—কথা বলতে বলতে কতদূর চলে এলুম, খেয়ালই ছিল না! আমি আর এগোচ্ছি না! ফিরতে কত দেরী হয়ে যাবে। আলেখ্য আবার খোঁজাখুঁজি করবে। আমি ফিরে যাচ্ছি। অমরনাথকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ইন্দু পিছন ফিরিয়া দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

অমরনাথ তাহার ফেলিয়া যাওয়া পথের দিকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে চাহিয়া রহিল। এক সময় ছোট্ট করিয়া হাসিয়া গন্তব্য পথের দিকে চলিল।

বারো

রে-সাহেব তাঁহার ঘরে আরাম কেদারায় শরীর এলাইয়া দিয়া একটি প্রবাসী পত্রিকার পাতায় অলসভাবে চোখ বুলাইতেছেন। বিদ্যাসুন্দরবাবুর বাটী হইতে আসিবার পর তাঁহার মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্নতা ভর করিয়াছিল ইদানিং তাহা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে। তবে সদ্য পরলোকগত নয়ন গাঙ্গুলির অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য তিনি তাঁহার দায়িত্বের কথা কিছুতেই তিনি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। আর কেহ না জানিলেও নয়ন গাঙ্গুলির বিধবা কন্যা ও অনাথ নাতিটিও অন্ততঃ জানে দুর্ঘটনার কথা শোনামাত্র তিনি গোপনে তাহাদিগের বাড়িতে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। কন্যা আলেখ্যর হঠকারিতার ফলে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, নয়ন গাঙ্গুলির অবর্তমানে তাহার পোষ্যদিগের কি গতি হইবে এই ব্যাপারে তিনি যে দায়িত্ব এড়াইয়া যান নাই, মুখ ঘুরাইয়া থাকিয়া নির্মম ঔদাসিন্যের পরিচয় দেন নাই এই কথা তিনি নিজে ছাড়াও অন্ততঃ আর দুইটি প্রাণী জানে। তবে এই কথাটি ত মিথ্যা নয়, কোন কিছুর বিনিময়েই নয়ন গাঙ্গুলির ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয়। তিনি ভাবিয়াছিলেন, নয়ন গাঙ্গুলির মৃত্যুর পর ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দিন কাটিয়া গিয়াছে, নদী দিয়া অনেক জলই বহিয়া গিয়াছে। ফলে ব্যাপারটি হয়ত অনেকাংশে থিতাইয়া আসিয়াছে। কোনরকমে আর কিছুদিন হইলে সম্পূর্ণ নির্ভয় হওয়া যাইবে। প্রজারা নিজ নিজ সমস্যা লইয়া হাবুডুবু খাইতেছে। অতএব নয়ন গাঙ্গুলির জন্য দীর্ঘদিন মাথা ঘামাইবার মত অবকাশ কোথায় তাহাদের। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বিষাদের কালো দাগটুকু মুছিয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর কার্যতঃ ঘটে আর এক। ব্যাপারটি প্রজাদের মনে যে তুষের আগুনের মত ধিকধিক করিয়া জ্বলিতেছে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়া আসিয়াছেন তাঁহারই বাল্যবন্ধু বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্য্যের বাড়ি গিয়ে। তিনি তাঁহার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। তবে হাঁ, বিদ্যাসুন্দরবাবু তাহাকে অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বলেই জ্ঞান করেন। নইলে মুখের উপর এতগুলো কথা বলিবার সাধ্য কাহার ছিল। তিনি ত যাহাকিছু শুনিয়াছেন, একটি শব্দও অসত্য নহে। কথাগুলি অপ্রিয় হইলেও খুবই সত্য। বাস্তবিকই সাহেব মহা ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন! বিদ্যাসুন্দরবাবুর কথায় রাগ করিবার যো নাই, সহ্য করিবার চেষ্টা করিলেও গায়ে জ্বালা ধরিয়া যায়। প্রবাসী পত্রিকার

পাতায় তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলেও দুই-চারটি ছত্রের বেশী তিনি আগাইতে পারিলেন না। নয়ন গাঙ্গুলির ব্যাপারটির কথা মনে পড়িলেই তাঁহার সবকিছু ওলট-পালট হইয়া যায়। মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলেন তিনি। আতংকে একেবারে এতটুকু হইয়া যান। কিন্তু কিসের ভয়, কাহার ভয়ে তিনি এমন মনমরা হইয়া পড়েন! অমরনাথের কি?

অমরনাথ ত আকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছে, রে-সাহেবের কোন অনিষ্টই তাহার দ্বারা হবে না। তাহা ছাড়া তাহার উপর আস্থা হারাইবারও কোন কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। অমরনাথ ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও তাহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়াছে, সে যে আবার তাহারই বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষেপাইয়া তুলিবে, অপর যে কেহ ইহা বিশ্বাস করিলেও তিনি অন্ততঃ বিশ্বাস করিতে তিলমাত্র উৎসাহও পাইতেছেন না।

রে-সাহেব দীর্ঘ প্রবাস-জীবনের পর স্ব-গ্রামে আসিয়া এমন এক জটিল আবর্তে জড়াইয়া পড়িয়া বিষয়-সম্পত্তির উপর নিতান্তই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। জমিদারির মোহ তাঁহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। এখন জমিদারি থাকিলেও তাঁহার এতটুকুও আনন্দ নাই, হস্তান্তরিত হইয়া গেলেও কিছুমাত্র আক্ষেপ হইবে না। কাহারও নিকট জমিদারির স্বত্ব বিক্রয় করিয়া দিতেও তাঁহার মন এতটুকুও কাঁদিবে না। সমাজ কোনটিকে ন্যায় বলিয়া মানিয়া লইবে, আবার কোন কাজকে গর্হিত আখ্যা দিবে, এই মুহূর্তে অন্ততঃ সেই বোধটুকু তাঁহার মন হইতে লোপ পাইয়াছে। মৃত্যু পথযাত্রী এক অশীতিপর বৃদ্ধ তাহাকে যেমন করিয়া কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছে, তাহার উৎস কোথায়? কাহার বলে বলীয়ান হইয়া বিদ্যাসুন্দরবাবু তাঁহাকে অপমান করিয়া গিয়াছেন। কাহার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে এমনটি ঘটতে পারে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই তিনি। অমরনাথের উপর দোষ চাপাইতে পারিলে একটি ব্যাপার অন্ততঃ পরিষ্কার হইয়া যাইত। কিন্তু এইরকম কিছু ভাবিতেও তাঁহার বুকের মধ্যে খচখচ করিয়া উঠিতেছে।

ব্যথিত-মর্মাহত রে-সাহেব যখন নির্বিষ্টচিত্তে তাহার যাবতীয় দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিবার জন্য উন্মুখ ঠিক তখনই কন্যা আলেখ্য তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল। বাবার চেয়ারের কাছে আগাইয়া যাইয়া বলিল—বাবা, তোমাকে বলেছিলুম, আশা করি স্মরণ আছে?

সাহেব বিষণ্ণ মুখেই বলিলেন—কি? কিসের কথা বলছো আলো?

আগামীকাল সকালে আমরা জমিদারি পরিদর্শনে যাচ্ছি।

রে-সাহেব বলিলেন—হাঁ, তা বলেছিলে বটে। কাল সকালেই তা হলে যাচ্ছ?

হাঁ বাবা।

ম্যানেজারবাবুও সঙ্গে থাকছেন ত?

ওনাকে ত বলেছি তৈরী থাকতে। কমলাকিরণবাবু আর ইন্দুও সঙ্গে যাবেন।

তোমরা যখন মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই নিয়েছ, আমার আর আপত্তির কি থাকতে

পারে? সাবধানে যাবে, চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলবে। তোমাদের তিনজনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে, বিচার-বুদ্ধিও জ্ঞানের প্রতি আস্থাও আমার রয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে কাজ করবে, এটুকুই বলতে পারি।

মহাত্মা গান্ধী দেশের মানুষের কাছে এক নতুনত্বের প্রতিশ্রুতি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ সুচিন্তার ফসল নন্-কোঅপারেশন। এই পদার্থটি যে সমাজের বুকে কি উন্নতির জোয়ার বহাইয়া দিবে, নাকি দেশটিকে রসাতলের অতল গহ্বরে পাঠাইবে তাহা লইয়া ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করিবার অবকাশ দেশের অধিকাংশ মানুষের অন্ততঃ নাই। পশ্চিমের দেশে প্রবাস-জীবন যাপনের সময় রে-সাহেব এই নন্-কোঅপারেশনের কত না প্রশস্তি গাহিয়াছিলেন। গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথই যে প্রকৃষ্ট পথ এই বিষয়ে তাঁহার মনে এতটুকুও বিরুদ্ধ ভাবনার উদয় হয় নাই।

আলেখ্যর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। দেশের কোথায় কি ঘটিতেছে তাহা লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া অযথা নষ্ট করার মত মানসিকতা তাহার কোনদিনই ছিল না, সময়ই বা কোথায়? খবরের কাগজের পাতায় বা ঘরোয়া বৈঠকে যখন লেংটি পরা সন্ন্যাসীটির নন্ কোঅপারেশন নামক বস্তুটির ঠাণ্ডা-গরম আলোচনা হইত তখন আলেখ্য ইচ্ছা করিয়াই অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সেই স্থান হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে প্রয়াসী হইত। তাহার ধারণা ছিল যে-সময়টুক এইরকম একটি হুজুগে ব্যাপার লইয়া কাটাইবে তাহা ব্যাট-হাতে টেনিস কোর্টে কাটাইলে খেলাটি তার একটু ভাল রপ্ত করিতে পারিবে। হুজুগে মানুষের অভাব আমাদের দেশে অন্ততঃ নাই। তাহারা নাচানাচি করুক গে। তাহার বাবা খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রিকার পাতায় নন্-কোঅপারেশন সম্পর্কিত প্রবন্ধাদি মাঝে মধ্যে পড়েন তাহা আলেখ্যর নজর এড়ায় নাই। এই উদ্ভট ক্রিয়া কাণ্ডটি সম্বন্ধে দু-চার কথা তাহার সঙ্গেও আলোচনা করিতে চেষ্টা করেন নি তাহাও সত্য নয়। আলেখ্য সতর্কতার সহিত সেই প্রসঙ্গ এড়াইয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ এই ব্যাপারে তাহার শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা কোনটিই প্রকাশ করে নাই। তাহার এইটুকুই ধারণা ছিল, বাবা অবসর জীবন যাপন করিতেছেন। সময় কাটাইবার মত কোন অবলম্বনই তাঁহার নাই। সে নিজে সাজসজ্জা ও টেনিস খেলা লইয়া মাতিয়া থাকে। তাহার মা-ও গত হইয়াছেন। অতএব নিঃসঙ্গ পিতাকে কিছু একটি লইয়া ত থাকিতে হইবে। আলেখ্য কি সেইদিন ঘুণাক্ষরেও ভাবিয়াছিল, এই নন্-কোঅপারেশনের ঢেউ একদিন তাহাকেও সরাসরি ধাক্কা মারিবে? স্বদেশী-গুণ্ডাদের গুণ্ডামির মোকাবেলা করিবার জন্য তাহাকে কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে হইবে? নন্ কোঅপারেশনের কুফল সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ প্রবাসে থাকা-কালীনই সে পাইয়াছিল, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইন্দুর বাবার গাড়ীর উইণ্ডসক্রীনটা যেদিন বিনা কারণে ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল সেদিনই সে বুঝিয়াছিল নন্-কোঅপারেশনের নামে দেশে একধরনের গুণ্ডামী শুরু হইয়াছে। তাহারা দেশের ধনী মানুষদের বিরুদ্ধাচারণ করাকেই একমাত্র কাজ হিসাবে বাছিয়া

লইয়াছে। সেদিন কমলকিরণদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া বাবার সহিত প্রথম অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে প্রথম মুখ খুলিয়াছিল। সে বার বার একই কথা বলিয়াছিল, কিছু সংখ্যক লোক দেশে গুণ্ডারাজ কায়েম করিতে চাহিতেছে আর কিছু শিক্ষিত অপদার্থ আড়াল হইতে তাহাদের মদত দিয়া চলিয়াছে। ব্যস, এই পর্যন্তই! সত্য বলিতে কি, কমলকিরণের বাবার গাড়ীটির উপর আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন নন্-কোঅপারেশনের প্রতি রে-সাহেবের মনে যে একটু হইলেও চিড় ধরিয়াছিল, মিথ্যা নয়।

কমলকিরণদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া রাগে-দুঃখে অপমানে উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে আলেখ্য তাহার বাবাকে বলিয়াছিল দেশোদ্ধারের নামে দেশ জুড়ে এ কী অরাজকতা শুরু হ'ল বাবা। এ কী দেশের কাজের নমুনা! স্বদেশী গুণ্ডারা ছাড়খাড় করে ছাড়বে।

রে-সাহেব সেইদিন মুখে প্রকাশ না করিলেও মনে মনে অন্ততঃ বলিয়াছিলেন—স্বদেশী আন্দেলনটা তাই বলে আদৌ নিষকলুষ না। এর মধ্যে বহু খাদ ঢুকেছে। একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে কিছু লোক গুণ্ডামি করে ভেস্তে দিল। আন্দোলন বিপথ গামী হ'ল শেষ পর্যন্ত!

পিতার কথায় আলেখ্য সেইদিন যথেষ্ট আনন্দিতই হইয়াছিল। স্বদেশী গুণ্ডাবা যে কমলকিরণের বাবা মিঃ ঘোষের গাড়ীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছে তাহাকে অন্ততঃ তাহার বাবা অন্ধের মত সমর্থন করেন নাই। বাবার বুদ্ধি সুদ্ধির উপর তাহাব কোনদিনই তেমন আস্থা ছিল না। এই বিশেষ গুণটি সে তাহাব মায়ের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া বৈষয়িক বুদ্ধিব ত প্রশ্নই ওঠে না।

আলেখ্য পিতার সহিত এক সময় বিলাতে কাটাইয়াছে। প্রাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর বিশেষ শ্রদ্ধা তখন হইতেই তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে অংকুরিত হইতে থাকে। দীর্ঘদিন প্রবাসে কাটাইয়া রে-সাহের স্বদেশে ফিরিয়া ওকালতি ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সুবাদে তাহার স্ত্রীও একমাত্র কন্যা আলেখ্যকেও পাটনা, মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাইয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। যে-সমাজে তাহার মেলা-মেশা ওঠাবসা ছিল সর্বত্রই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে অন্ধের মত অনুকরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। রে-সাহেবের স্ত্রীর মধ্যেও এই অনুকরণপ্রিয়তা সুস্পষ্ট ছিল। তাই বাঙালিয়ানার প্রভাব তাহার কন্যা আলেখ্যর মধ্যে আশা কবা শুধুমাত্র নিরর্থকই নয়, পাগলের প্রলাপ বলিলেও অত্যুক্তি হবে না।

আলেখ্য শুধুমাত্র এইটুকুই জানিত গ্রামে তাহাদের জমিদারি বলিয়া একটি কল্পবৃক্ষ বা কামধেনু রহিয়াছে যাহার দ্বারা অনয়াসে আর্থিক সুবিধাদি লাভ করা যায়। ইহার জন্য ব্যয় নাই বলিলেও চলে, আয় আশাতীত। গ্রামে আসিয়া আলেখ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিল, জমিদারির অর্থাগমের নিমিত্ত যৎসামান্য যেটুকু ব্যয় হয় তাহার অধিকাংশই প্রয়োজনবহির্ভূত। অনায়াসে কাটিয়া ছাঁটিয়া

ব্যয়ভার অনেকাংশে লাঘব করা যাইতে পারে।

রে-সাহেব প্রবাসী পত্রিকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কন্যাকে কহিলেন—কিছু বলবে ?

সকালে ভটচায্যি মশায় এসেছিলেন। তুমি বাড়ি ছিলে না। বেড়াতে বেরিয়েছিলে। মন্দিরের পুজোর জন্য এ-বছর বরাদ্দ একটু বাড়িয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করছিলেন। আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেচি বাবা।

সাহেব পত্রিকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই অন্যমনস্কভাবে কন্যার কথার উত্তর দিলেন—এ জমিদারি তোমার। একে রক্ষণাবেক্ষণ করতে তুমি যে-সিদ্ধান্ত নেবে, আমার সমর্থন পাবে মা।

বলছিলুম কি, মন্দিরের পুজোর জন্য বছরে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তার পরিমাণ কিন্তু নেহাৎ কম নয়। তাই আমি ভটচায্যি মশাইকে বলে দিয়েছি সামনের মাস থেকে পুতুল-পুজা বন্ধ রাখতে।

সাহেব যেন অকস্মাৎ সম্বিত ফিরিয়া পাইলেন। তিনি সচকিত হইয়া পত্রিকা হইতে মুখ তুলিয়া কন্যার দিকে চাহিলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন—সে কী কথা আলো! মন্দিরের পুজো বন্ধ করে দিতে হুকুম দিয়েছে!

কেন ? অপরাধ কোথায় দেখলে বাবা ? তুমিও ত মূর্তি-পুজায় বিশ্বাসী নও। আর এই বিশ্বাসহীনতার ফলেই তুমি সমাজে যাতায়াত শুরু করেছিলে। আজ আবার মাটি-পাথরের পুতুলের ওপর তোমার বিশ্বাস এমন প্রকট হয়ে উঠল যে! আমি বিশ্বাসই করতে পারচি না। পুতুল-পুজোর জন্য তোমার মধ্যে এমন অত্যুগ্র আগ্রহের সঞ্চার হতে পারে।

সাহেব হাতের পত্রিকাটি পাশের টেবিলে রাখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। দুই পা হাঁটিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। বাইরের উন্মুক্ত আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া এক সময় বলিলেন—আলো, এই অনাবশ্যক খরচকে কেন্দ্র করিয়া তোমার মায়ের সঙ্গেও আমার কম অশান্তি হয় নাই, জানো নিশ্চয় ? তিনি প্রায়ই পুজো বন্ধ করতে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতেন।

আলেখ্য বলিল—মায়ের ইচ্ছাই আমি আজ পূর্ণ করতে চলেছি বাবা। কতগুলো পাথরের পুতুলকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর পিছনে সামান্যতম যুক্তি খুঁজে পেলেও আমি ভট্চায্যি মশাইকে এমন আদেশ কখনই দিতুম না। যাঁরা দিলেও আপত্তি করেন না, না দিলেও বলপূর্বক আদায় করে নিতে পারেন না, তাঁদের জন্য ব্যয়কে আমি অনাবশ্যক বলেই মনে করি। পুজারী ব্রাহ্মণকে আমি বলে দিয়েছি, চাকরি তাঁর যাবে না। মন্দিরে পুজা করিয়ে তিনি যে মাসোহারা পান তা অন্য কাজের বিনিময়ে ঠিকই পেয়ে যাবেন। ওনাকে কি কাজে নিযুক্ত করা হবে, পরে

জানিয়ে দেব বলেচি।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সাহেব বলিলেন—মা আলো, জমিদারির দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করলেও এ-কাজে কিছুতেই তোমায় উৎসাহ দিতে পারছি নে। তোমায় আগেও বহুবার আমি বলেছি, মাটি ও পাথরের যে-বিগ্রহগুলো নিয়ে তোমার ও তোমার মায়ের সঙ্গে বহুবার সংঘাত বেঁধেছিল সেগুলোর প্রতিষ্ঠা আমার দ্বারা হয় নি। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কাঁধে ভর করেও তাঁরা মন্দিরে আসেন নি। অতএব তাঁদের সেবা বন্ধ করার অধিকারই বা আমার কোথায়?

বাবা, এ ধরনের কথায় দুর্বলচিত্তকে প্রবোধ দেয়া চলে, বাস্তবে খাটে না। বাস্তবের কষ্টি পাথরে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব, বিগ্রহগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিত পূজাআর্চার জন্য যে ব্যয় হয় বিনিময়ে একটা কানাকড়িও তোমার তহবিলে আসে না। পুরোহিত ভটচাযি্য মশাই বিরাট ফর্দ দিয়ে গেছেন। মন্দিরের দরজা-জানালা মেরামত ও রং করা আশু প্রয়োজন, নাটমন্দিরের চালাটি ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সম্পূর্ণরূপে পাল্টানো দরকার। আমার ত মনে হচ্ছে, অহেতুক এতগুলো টাকার শ্রাদ্ধ না করাই উচিত। আর তুমি যুক্তি দেখাচ্ছ, পূর্ব পুরুষরা বিগ্রহগুলো প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। একটা কথার জবাব দেবে বাবা? পূর্ব পুরুষরা—যাঁরা মন্দির তৈরী করে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে যে বিরাট ব্যয়ের বোঝা তাঁদের উত্তর-সুরীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন, এটাকে ত তাঁদের পর্বত প্রমাণ ভুল বলেও মনে করতে পার?

হতে পারে তুমি যা বলছ সবটুকুই সত্যিই।

তাই যদি হয় তবে এত বড় একটি ভুল বংশ পরম্পরায় চলতে থাকবে তারই বা কতটুকু যুক্তি রয়েছে, বুঝছি না।

আলো, তুমি কেন মনে করছ, তাঁরা তোমার আমার ঘাড়ে ব্যয়ের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। যে বিগ্রহগুলো আজ তোমার কাছে বোঝা বলে মনে হচ্ছে, তাঁদের ব্যয় বহনের চিন্তা আগেভাগেই করে রেখে গেছেন তাঁরা। যে পরিমাণ দেবোত্তর সম্পত্তি রয়েছে তা দিয়ে ত অনায়াসেই—

তাহাকে কথাটি শেষ করিতে না দিয়াই আলেখ্য বলিয়া উঠিল—দেবোত্তর সম্পত্তির আয়কে ত অন্য কাজেও ব্যয় করে এ অর্থসংকটের হাত থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে, আপত্তির কি আছে? মূর্তি-পূজার বিরুদ্ধে তুমি যে মনোভাব পোষণ করতে আসলে সবই—আলেখ্য কথাটি শেষ না করিয়া অন্যদিকে প্রসঙ্গটিকে লইয়া গেল—ম্যানেজার ব্রজবাবুকে আমি ডেকেছিলাম। তহবিলের অবস্থা সম্বন্ধে আশা করি তোমায় খুলে বলার দরকার নেই। পুজোর ব্যয়ভার কোত্থেকে সে—

আলো, তুমি ত জান, আমি সোজা কথার মানুষ। বুড়ো হয়েছি। আয়ের পথ আমার বন্ধ। তোমার ভাষায় আমার দ্বারাও দু'পয়সা অর্থাগম হয় না। আমার গ্রাসাচ্ছদনের জন্য যেভাবে অর্থ সংগৃহীত হবে, মন্দিরের পুতুলদেবতাদের জন্যও

একই চিন্তা করতে হবে, শুধুমাত্র এটুকুই জানি।

আলেখ্য পিতার দৃঢ়তাটুকুকে অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া রাগে গজগজ করিতে করিতে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আলেখ্য বিষন্ন মনে বৈঠকখানায় গিয়া একটি চেয়ারে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল। কমলকিরণ ম্যাপে মুখ গুজিয়া জমিদারি পরিদর্শনে বাহির হইয়া প্রথমে কোথায় যাইবে, কোন পরিস্থিতির সহিত কিরূপে মোকাবেলা করিবে, মনে মনে তাহার একটি ছক কষিবার কাজে আত্মমগ্ন। বিষন্নমুখে আলেখ্যকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সে বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখা ঠোঁটের কোনে ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল—কি ব্যাপার, রণে পরাজিত হয়ে পশ্চাদাপসরণ করতে বাধ্য হলে, মনে হচ্ছে?

আলেখ্য কোন উত্তর দিল না। আড় চোখে মুহূর্তের জন্য কমলকিরণের মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

কমলকিরণ বলিল—আমি কিন্তু তোমায় সবুর করতেই পরামর্শ দিয়েছিলুম, শুনলে না। পরাজয় নিশ্চিত জেনে কোন কাজে অগ্রসর হওয়াকে বোকামি ছাড়া আর কি বলতে পারি।

তুমি দেখে নিয়ো, পুতুল-পুজো আমি বন্ধ করবই। যেকোন ভাবে অযথা এতগুলো টাকা ব্যয় আমি কিছুতেই করতে দেব না। আজ না হোক কাল, বন্ধ আমি করবই।

আমি কিন্তু ব্যয় লাঘব করার চেয়েও আয় বৃদ্ধির ওপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করছি আলো। আর এটাই বোধহয় অধিকতর সহজ।

আলো চেয়ারটি টানিয়া কমলকিরণের দিকে কিছু সামান্য অগ্রসর হইয়া বসিল।

কমলকিরণ সোৎসাহে বলিতে লাগিল—শোন, ম্যাপে এই যে ফাঁকা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে আর পতিত জমি হিসাবে গণ্য করা ঠিক হবে না। শিল্পোৎপাদনের কাজে একে অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আলেখ্য ম্যাপটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই অস্ফুট উচ্চারণ করিল—হুঁ।

কমলকিরণ বলিয়া চলিল—মোদ্দা কথা হচ্ছে, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। তার জন্য চাই নতুন নতুন পরিকল্পনা। শুনে রাখ উৎপাদানাত্মক ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়া উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়।

দেশের যা অবস্থা, কোন কিছুতেই ভরসা রাখতে পারছি নে।

দেশের লোক যে কি চায়, মাথামুণ্ড তা-ও বুঝিনে! জমিদার আর ধনী লোকদের কাজে বেগড়া বাঁধানো আজ যেন মানুষের একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাল-মন্দর বিচার নেই, ন্যায়-অন্যায় নিয়ে বিচার-বিবেচনা নেই কিছু একটা করতে গেলেই হাভাতেগুলো হৈ হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

দরকার হলে যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পুলিসের সাহায্য নিতে হলেও দ্বিধা করব না। ঘা কতক পিঠে পড়লে বাপ্ বাপ্ বলে পালাবার পথ পাবে না, দেখে

নিও। ছোটলোক গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে কোনরকম আপোষ রফা করতে গেছ কি, নিজের পায়ে কুড়োল মেরেছ। যে-রোগের যে-ওষুধ—অনুপান ঠিক না হলে রোগ সারবে কেন।

থানা পুলিসের ব্যাপারটায় আমার যেন কোনদিনই তেমন উৎসাহ নেই। তাদের শরণাপন্ন হলে কাজের চেয়ে অকাজই হয় বেশী।

দেখ, আমার দরকার কাজ হাসিল করা। দরকার হলে বেধরক লাঠিপেটা করতে হবে। দেশের লোকের মেরুদণ্ড কত শক্ত আমার আর বুঝতে বাকী নেই। যতসব ভীরুর দল! একটা কথা জানবে, বিপ্লব করতে স্টেমিনা চাই। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। অন্নচিন্তা যাদের চমৎকার, তারা করবে বিপ্লব! ভাবলেও হাসি পায়। বন্দুকের গুলি ব্যবহার করতে হবে না, কঁদো দিয়ে ঘা কতক দিলেই বিপ্লবের বুলি চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে।

আলেখ্য বলিল—তা আমিও ভালই জানি, ওদের দিয়ে বিপ্লব হবে না, হতে পারে না। শক্তহাতে হাল ধরতে পারলে পালিয়ে বাঁচার পথ পাবে না। আসলে চিন্তা আমার লেংটিপড়া ছোটলোকগুলোকে নিয়ে নয়।

তবে?

ভয় হচ্ছে, ওদের উস্কানি দেয়ার লোকের অভাব নেই। নিরক্ষর বিচার বিবেচনাহীন লোকগুলোকে তাতিয়ে দেয়া খুবই সহজ। সামান্য একটু মদত পেলেই জীবন তুচ্ছ করে হাভাতে ছোটলোকগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তা-ত হতেই পারে।

হতে পারে নয়, এটাই অবশ্যম্ভাবী।

তখনই এলোপাথারি লাঠি চালাতে হবে। এ কী রাম-রাজত্ব পেয়েছে নাকি, যা খুশী করবে! মানুষের বাঁচার অধিকার থাকতে পারে। কিন্তু হাভাতেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার দায়ভার আমাদেরই বহন করতে হবে, কোন দেশী আব্দার!

জমিদারের জমি ভোগ করছ, খাজনা দেবে ব্যস, এটুকুই সম্পর্ক। দেশে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অজন্মা, খাদ্যাভাব—অত কথা এর মধ্যে কোত্থেকে আসে জানি নে বাপু! দেশে কি গভর্ণমেণ্ট নেই? যত রকম অভাব-অভিযোগ আছে জানাও, সুরাহা করে দেবেন। যত রকম অন্যায় বায়নাক্কা জমিদারদের ওপর।

ছোটলোকগুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন তোমাদের অনুপস্থিতিতেই আজ এই সর্বনাশ। লুঠের মাল—এতদিন দশহাতে লুঠেপুঠে খাচ্ছিল। আমাদের আকস্মিক আগমনে মাথায় হাত পড়েছে, বুঝছই ত।

কমলকিরণ ও আলেখ্য যখন জমিদারির উন্নতি বিধানে আত্মমগ্ন তখন চটির ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ তুলিয়া ম্যানেজার ব্রজবাবু দরজায় দাঁড়াইলেন।

ম্যানেজার ব্রজবাবুর আগমনে তাহাদের আলোচনায় বাধা পড়িল।

ব্রজবাবু নমস্কার জানাইয়া নিবেদন করিলেন—দাদা, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন শোনলুম।

আলেখ্য ঘাড় ঘুরাইয়া কহিল—হাঁ। ম্যানেজারবাবু কাল সকালে আমরা জমিদারি পরিদর্শনে যাচ্ছি, আশা করি মনে আছে?

আজ্ঞে, আমাকেও কি সঙ্গে যেতে হবে?

অবশ্যই। আমারা এখানে নতুন। রাস্তাঘাট কিছুই জানা নেই।

আপনার আদেশ হলে আপত্তির ত প্রশ্নই ওঠে না। ভাল কথা, কর্তা মশাইও সঙ্গে যাচ্ছেন কি?

না, বাবাকে আর এর মধ্যে জড়াতে চাইছি নে। তাছাড়া ওনার শরীরও তেমন ভাল নয়, সারাদিনের ধকল সইতে পারবেন না।

হাঁ, আমিও তাই ভাবছিলুম।

কিভাবে যাওয়া যাবে, ভেবেছেন কিছু?

আজ্ঞে আমি ত ভাবছি পাল্কি করে যাওয়াই ভাল।

এ ছাড়া আর কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে?

আর কি-ইবা বলি? কর্তামশাই ত জলপথের কথাই আমায় বলে দিয়েছিলেন। বর্ষাকাল, নদীতে ভালই জল আছে। বজরা অনায়াসে চলতে পাবে। অবশ্য সড়ক পথে যদি আগ্রহী হন তবে সে ব্যবস্থাও সম্ভব।

সড়ক পথে? এতগুলো লোক, আপনাকে নিয়ে পাঁচ-ছ জন ত হবেই। সড়ক-পথে যাবার কি ব্যবস্থা সম্ভব?

দুটো মাত্র উপায় রয়েছে। এক হয় গরুর গাড়ী, না হয় পাল্কি।

না, না। গরুর গাড়ী একেবারেই অচল, বড্ড সেকেলে ম্যানেজার বাবু। তবে পাল্কি হলে তবু চলতে পারে। কমলাকিরণ পাল্কির ব্যবস্থাটিকে নাকচ করিয়া দিল। তাহার মতে সহরের মানুষের কাছে সড়ক পথের চেয়ে জলপথের আকর্ষণই বেশী।

আলেখ্য বলিল—তবে আপনি বরং বজরার ব্যবস্থাই করুন।

ব্রজবাবু ঘাড় কাৎ করিয়া সম্মতি জানাইতে যাইয়া বলিলেন—তবে বজরার ব্যবস্থাই করি গে। কথা বলিতে বলিতে তিনি চৌকাঠ পর্যন্ত গেলেন।

আলেখ্য তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—ম্যানেজারবাবু মাঝিকে বলবেন যেন খুব সকালেই বজরা নিয়ে ঘাটে উপস্থিত থাকে। নইলে ফিরতে আবার দেরী হয়ে যাবে।

তাই হবে। ঘাড় কাৎ করিয়া সম্মতি জানাইয়া ব্রজবাবু বিদায় লইলেন।

তেরো

কাকডাকা সকালে বজরাটি জমিদার বাটীর ঘাট হইতে যাত্রা করিল। নদীর বুক চিঁড়িয়া সুদৃশ্য বজরাটি ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। নদি বাহিত

সকালের ঝিরঝিরে বাতাস আলেখ্যর কাছে বড়ই উপভোগ্য হইয়া উঠিল। নদীর দুই ধারের পাট গাছগুলি মাথা আন্দোলিত করিয়া বজরা যাত্রীদের স্বাগত জানাইতে লাগিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আলেখ্য মাঝিকে ঘাটে বজরা দাঁড় করাইবার নির্দেশ দিল। ব্যাপারটি ব্রজবাবুর বিশেষ মনঃপূত হইল না। বিস্মিতও কম হইলেন না। কারণ, ম্যাপে এইস্থানের উল্লেখ নাই। অকারণে এমন করিয়া যেখানে-সেখানে বজরা দাঁড় করাইলে আসল কাজ পণ্ড হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু বজরা না ভিড়াইয়া বা মাঝির উপায় কি? কর্ত্রীর ইচ্ছাতেই ত কর্ম করিতে হইবে। ব্রজবাবু বাধ্য হইয়া মৌন রহিলেন।

মাঝি ঘাটে বজরা ভিড়াইল। ছোট-বড় কয়েকটি নৌকা ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। কেহ এইমাত্র যাত্রী নামাইয়াছে। আবার কেহ বা যাত্রী বোঝাই করিয়া পারাপারের জন্য রওনা দিবার প্রস্তুতি লইতেছে। ইতিমধ্যে দুইটি মালবাহী নৌকা ঘাটে ভিড়িল। একটিতে বিভিন্ন রকম কাঁচা সবজী, আর অন্যটিতে ভুঁসিমাল বোঝাই। হাটে যাইবে।

আলেখ্য ঘাটের সর্বত্র এক পলক চোখ বুলাইয়া ব্রজবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—এই খেয়া ঘাট হইতে কি পরিমাণ আয় হয়, বলুন ত ম্যানেজারবাবু?

ব্রজবাবু নীরব দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবুকে নীরব দেখিয়া আলেখ্য এইবার বেশ একটু গম্ভীর স্বরেই উচ্চারণ করিল—ম্যানেজারবাবু, চুপ করে রইলেন যে বড়। এই ঘাট হইতে বছরে কত আয় হয়? আনুমানিক অংকটা বললেই চলবে।

হাত কচলাইয়া ব্রজবাবু বলিলেন—আসলে প্রশ্নটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। দিদিমণি কি জানতে চাইছেন, দয়া করে যদি খোলসা করে বলেন বড়ই সুবিধে হয়।

প্রশ্নটা কি খুবই কঠিন বলে মনে হচ্ছে? জানতে চাইছি, এই ঘাট থেকে জমিদারের আয় আনুমানিক কত?

জমিদার কন্যার কথায় ব্রজবাবু যেন আচমকা আকাশ হইতে পড়িলেন। কোনরকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—খেয়া-ঘাট থেকে আবার জমিদারের আয় কিভাবে হতে পারে, মাথায় আসছে না ত। গরীব মাঝিরা খেয়া পারাবার করে কোনরকমে বৌ-ছেলে মেয়েকে—

আলেখ্য রীতিমত খেঁকাইয়া উঠিল—ম্যানেজারবাবু, এ কী রাম-রাজত্ব পেয়েছেন সবাই! পয়সা রোজগার করবে, জমিদারের প্রাপ্য দেবে না!

কিন্তু এখানে যে আবহমান কাল থেকে এ-ব্যবস্থাই চলে আসছে দিদিমণি। অন্ততঃ আমি চাকরিতে বহাল হয়ে অবধি—

চলে আসছে বলে যে যুগযুগান্ত ধরে চলবে, এমন কোন কথা আছে কি?

হাত কচলাইয়া অধিকতর নরম সুরে ব্রজবাবু বলিলেন—না, তেমন কথা অবশ্য

নেই, ঠিকই। তবু নতুন কোন নির্দেশ—

তাহাকে থামাইয়া দিয়া আলেখ্য বলিল—থাক, আপনাকে আর মাঝিদের হয়ে ওকালতি করতে হবে না। দয়া করে মাঝিদের আমার সামনে হাজির করার ব্যবস্থা করুন।

ব্রজবাবু অনন্যোপায় হইয়া বজরা হইতে হাঁটু-সমান জল কাদায় নামিয়া ডাঙায় উঠিলেন। ডাকাডাকি করিয়া মাঝিদের সবাইকে জমিদার-কন্যার সামনে হাজির করিলেন। তাহারা আভূমিলুণ্ঠিত হইয়া জমিদার-কন্যাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে তাহার সামনে দাঁড়াইল। আলেখ্য রীতিমত কড়া মেজাজে বলিল—শোন অতীতের কথা ভুলে যাও সবাই। এতদিন যে নিয়মে জমিদারি কাজকাম চলে এসেছে, আজ সেসব আইনই বল, আর ব্যবস্থাই বল, ভুলে যেতে হবে। এখন থেকে আর নিখরচায় ব্যবসা করা যাবে না। আগামী রবিবার এ ঘাট, না, শুধুমাত্র এ ঘাটই নয় আমার জমিদারির এক্তিয়ারে যত ঘাট আছে সব নিলাম হবে। সবচেয়ে বেশী টাকা জমিদারের তহবিলে যে জমা দিতে পারবে তারই ওপর খেয়া পারাপারের অধিকার বর্তাবে। ঘাটের ইজারা পেয়ে সে ই এখানে ব্যবসা করতে পারবে, বুঝেছ ?

মাঝির দল করজোড়ে মিনতি জানাইল—মা ঠাকরুণ, সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে নৌকো বেয়ে যে যৎসামান্য আয় হয় তা দিয়ে ছেলেপুলেকে এমনিতেই পেটপুরে খেতে দিতে পারিনে! তার ওপর বাজারে জিনিসপত্রের দাম যেমন আকাশছোঁয়া—নুন আনতে পান্তা ফুরোয়! আবার যদি জমিদারকে—

মাঝিদের থামাইয়া দিয়া কমলকিরণ বলিয়া উঠিল—তোদের বলিহারি আব্দার যে বাবা! জমিদারের ঘাটে নৌকো বেয়ে যা রোজগার করবি, সবই নিজেদের পেটে দিবি! জমিদারের তবে চলবে কি করে, শুনি ? কথায় কথায় এরকম দানছত্র খুললে জমিদারি যে দু দিনেই লাটে উঠে যাবে রে ?

ম্যানেজারবাবু, কালই আমার এক্তিয়ারে যত ঘাট আছে সব মাঝিকে খবর দেবার ব্যবস্থা করুন। আগামী রবিবার সকালে কাছারি বাড়িতে সবাইকে জড়ো হবার নির্দেশ দিন, প্রয়োজনে ঢোল পিটিয়ে দেবেন।

সব ঘাট নিলাম হবে। মাঝিদের মধ্যে যে সর্বোচ্চ দাম দিতে পারবে সে-ই ঘাটের ইজারা পাবে, ঘাট ব্যবহারের অধিকার অর্জন করবে, বুঝলেন ?

ব্রজবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বলিলেন—এভাবে সামনের হাতী অপেক্ষা পিছনের মশাটাকে বড় করে দেখলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপত্তির সম্ভাবনা দেখা দেয় দিদি। জমিদারি আপনার। আমি কর্মচারীমাত্র। যা বলবেন, আদেশ পালন করব।

আলেখ্য ধমকের সুরে বলিলেন—ম্যানেজারবাবু, উপদেশ নয়, কাজ চাই। মনে থাকে যেন, আগামী রবিবারই যেখানে, যত খেয়া-ঘাট আছে নিলাম ডাকার ব্যবস্থা করবেন।

ব্রজবাবু ঘাড় কাৎ করিয়া সম্মতি জানাইলেন।

আলেখ্যর নির্দেশে বজরা আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদূরে যাইবার পর নদীর বাঁধের উপর কতগুলি সারিবন্ধ ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের দিকে আলেখ্যর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ব্রজবাবুকে ডাকিয়া কহিল—ম্যানেজারবাবু, এরা কারা? বাঁধের ওপর রীতিমত সংসার পেতে বসেছে, দেখছি!

এরা সাঁওতাল, দুলে, বাগদী প্রভৃতি সমাজের নীচু স্তরের সম্প্রদায়।

বাঁধের ওপর ঘর বেঁধেছে—জমিদারের অনুমতি আছে কি?

দিদি, সত্য বলতে কি, এরা কারো অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। ফাঁকা জায়গা পেলেই ঝুপড়ি তৈরী করে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে নেয়। তীর-ধনুক নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। মাঠে ঘাটে খরগোশ, মেঠো-ইঁদুর, কাঠবিড়ালি প্রভৃতি শিকার করে উদরপূর্তি করে। কখনও নদী নালায় মাছ ধরে, কামলা খেটে কোনরকমে—

তাঁহাকে মাঝ পথে থামাইয়া দিয়া কমলকিরণ বলিল -এ কী রকম কথা ম্যানেজার-বাবু! এদের দায়ভারও কি জমিদারকে বইতে হবে?

মুখবিকৃত করিয়া আলেখ্য বলিল—না না। এরকমটা চলতে পারে না। আপনি হয়ত বলবেন, বংশপরম্পরায় এ-ব্যবস্থা চলে আসছে। বাঁধের ওপর এসব জঞ্জাল আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না, শুনে রাখুন। তিনদিনের মধ্যে বাঁধে যেখানে, যত কুঁড়েঘর রয়েছে, পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। নতুন যেসব লেঠেল নিযুক্ত করা হয়েছে, প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করবেন। তাতেও যদি কাজ না হয় তবে পুলিশের সাহায্য নিতেও দ্বিধা করবেন না। মনে রাখবেন, সময় মাত্র তিনদিন।

ব্রজবাবু ঘাড় কাৎ করিয়া বলিলেন—তা অবশ্যই মনে থাকবে দিদি। তবে কথা হচ্ছে—

তাহাকে নামাইয়া দিয়া আলেখ্য রীতিমত কড়া সুরে কহিল—কথা নয়, কাজ চাই। কাজ— আমি কাজ চাই ম্যানেজারবাবু।

আচমকা কড়া ধমক খাইয়া ব্রজবাবু চুপ করিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে বজরা অনেক পথ আগাইয়া গেল।

কমলকিরণ বলিল—কিন্তু আলো, এসব জঞ্জাল দু'দিনেই পরিষ্কার করে দেয়া যাবে। সমস্যা হচ্ছে—

সমস্যা? কিসের সমস্যা?

সমস্যা হচ্ছে কাকাবাবুকে নিয়ে। জমিদারের স্বার্থের চেয়ে প্রজার চোখের জলের দাম ওনার কাছে অনেক বেশী।

কিসের প্রজা? কারা প্রজা? জমিদারকে যারা এক পয়সা খাজনা দেয় না। তারা আবার প্রজা কিসের! তাছাড়া বাবা যা-ই বলুন, জমিদারিটা এখন আমার। আমাকে পুরোপুরি মৌরসি পাট্টা দিয়ে দিয়েছেন। আমি চাই, জমিদারিটাকে একটা লাভজনক সংস্থায় পরিণত করতে। আমার স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে যদি

আরও কয়েকজন নিয়ন গাঙ্গুলির পথ ধরে তবু পিছপাও হ'ব। ভদ্র শিক্ষিত, রুচি-শীল সমাজ গড়তে গিয়ে কিছু উটকো জঞ্জাল ত সরাতেই হবে।

কমলাকিরণ মানচিত্রের একস্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল—ম্যানেজারবাবু, মনে হচ্ছে, সামনের এই ঘাটে আমাদের নামতে হবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা সবাই তৈরী হয়ে নিন, সামনের ঐ ঘাটেই বজরা দাঁড়াবে, নামতে হবে।

মাঝি একটি ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছের কাছে বজরা থামাইল।

বজরা হইতে নামিয়া মাত্র মিনিট দুই-তিন পথ হাঁটিয়া তাহারা সদলবলে সুপ্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত উঁচু একটি স্থানে উপস্থিত হইল। ইহাদের বৈষয়িক ব্যাপারে ইন্দুর তেমন আগ্রহ নাই। সে আলের উপর দিয়া হাঁটিয়া আধ-পাকা ধানক্ষেত দেখিতে লাগিল।

ব্রজবাবু আলেখ্য ও কমলাকিরণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন--চিনির কলের পক্ষে এজায়গাটাই উপযুক্ত। কতগুলো বাড়তি সুযোগ এখানে পাওয়া সম্ভব, যা এ ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য।

আলেখ্য কহিল—যেমন ?

যেমন ধরুন, চিনির কল চালাতে গেলে কাঁচামাল আখের অভাব হবে না এখানে। নদীর দুই পাড়ে প্রচুর আখের চাষ হয়। হাত বাড়ালেই নদী, জলের সমস্যাও নেই। আর—আর সুলভ শ্রমিক চাই। আলেখ্য বলিল।

ব্রজবাবু বলিলেন—সস্তায় শ্রমিক যোগারও এখানে সমস্যা হবে না মোটেই। সস্তা বলছেন কি দিদি : বাঁধের ওপর যেসব বুনো বাগদীদের দেখে এলেন, নামমাত্র বেতন দিলেই গাধার মত খাটিয়ে নিতে পারবেন।

কমলাকিরণ সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—ঠিক এরকম শ্রমিকই এধরণের শিল্পের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। মজুরি কম, শ্রম দেবে বেশী। নইলে ব্যবসায় লাভের মুখ দেখা যাবে না।

ব্রজবাবু বলিলেন—কাঁচামাল আমদানি করার ব্যয়ও অনেক কম। কারখানার নিজস্ব নৌকো কিছু থাকলে ত কথাই নেই।

আলেখ্য বলিল-চমৎকার বুদ্ধি। নিজস্ব নৌকো থাকলে নামমাত্র খরচে জলপথে আমও আনা যাবে। আর উৎপাদিত চিনিও শহরে চালান দেওয়া সম্ভব।

কমলাকিরণ বলিল—আমার কিন্তু জায়গাটা খুব পছন্দ !

আলেখ্য বলিল—ম্যানেজারবাবু, আর দেরী নয়, কালই লোকজন লাগিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে ফেলুন।

সুযোগ বুঝিয়া ব্রজবাবু বলিলেন—তবে কি বুনো-বাগদীদের বাঁধের ওপর থেকে উচ্ছেদের নোটিশ দেব ? ওদের ক্ষেপিয়ে না দিলে নামমাত্র মজুরিতে কাজ হাসিল করা যেত। গায়ে হাতীর বল ধরে ওরা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগিয়ে সূর্যাস্ত

পর্যন্ত হাসিমুখে খেটে যাবে।

কমলকিরণ বলিল— আমরা এমন লেবারই ত চাচ্ছি ম্যানেজারবাবু। অল্প গুড়ে বেশী মিষ্টি—সব সময় লক্ষ্য রাখবেন।

আলেখ্য বলিল—তবে আর ওদের ঘাটিয়ে দরকার নেই ম্যানেজারবাবু। ওরা বাঁধের ওপর যেমন আছে থাক। আপনি কাল থেকেই কাজ শুরু করে দিন।

ব্রজবাবু ঘাড় কাৎ করিয়া সম্মতি জানাইতে যাইয়া বলিলেন—আপনার হুকুম যখন পেয়ে গেছি, দেরী করার প্রশ্নই ওঠে না।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা আবার বজরায় উঠিল।

চৌদ্দ

বজরা পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল।

কমলকিরণ জামার পকেট হইতে ম্যাপটি বাহির করিল, তাহার ভাজ খুলিয়া তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে ম্যাপটির উপর চোখ বুলাইয়া বলিল—ম্যানেজারবাবু এইবার আমাদের গন্তব্যস্থল তবে হাটখোলা।

আজ্ঞে হ্যাঁ। ডানদিকের ঐ উঁচু গাছটার গায়েই ঘাট। ওখানে নেমে দুই-তিন মিনিটের হাঁটা-পথ।

আলেখ্য বলিল—আজ ত আবার মঙ্গলবার, হাটে লোকজনের ভিড় হবে কি?

ভিড় ত হবেই দিদি। রবিবারের তুলনায় মঙ্গলবারের হাটই ভাল জমে এখানে।

কমলকিরণ বলিল—এই ত চাই। জনসমাগম না হলে, রীতিমত গমগম না করলে হাটের ইজ্জতই থাকে না।

জানি না সেখানে কিরকম পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে।

পরিস্থিতি যা-ই হোক দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। মনে রাখবে, আমাদের সামান্যতম দুর্বলতা আভাষ পেলেই ক্ষুদে গান্ধীর দল একেবারে মাথায় চেপে বসবে। কমলকিরণ বলিল।

আলেখ্য এইবার বলিল—ম্যানেজারবাবু, আপনাকে বলেছিলুম, হাটে পুলিস মোতায়েন করতে। বড় দারোগার সঙ্গে যোগাযোগ করতে, করেছিলেন?

ব্রজবাবু শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিমণি, করেছিলুম।

কমলকিরণ বলিল—প্রয়োজনে ঐ দেবতাটাকে দু'দশ টাকা পকেটে গুঁজে দিয়ে দিতে ভুলবেন না ম্যানেজারবাবু।

আলেখ্য বলিল—হাঁ, ঠিকই বলেছ। যে-দেবতার পুজোর যে-রীতি। যা দিনকাল পড়েছে, ঐ দেবতাটাকে সন্তুষ্ট না রাখলে জমিদারী টিকিয়ে রাখাই মুশকিল। এখন আর শুধুমাত্র লেঠেলদের ওপর ভরসা রাখা যাবে না।

কমলকিরণ বলিল—ম্যানেজারবাবু, ঐ বাঁ-হাতের ব্যাপার স্যাপারগুলো আপনা-

কেই করতে হবে। আমাদের গায়ে আবার বনেদী বংশের রক্ত বইছে কিনা, ওসব তেমন পারি নে। আসলে বংশ পরম্পরায় অপরের তোষামোদই পেয়ে এসেছি। হঠাৎ করে কাউকে তোষামোদ করতে বিবেকে কেমন বাধে। অথচ অহংকার নিয়ে বসে থাকলেও অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। দেশের হাড়হাভাতে গুলো আগে আগে—

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া আলেখ্য বলিল—একদিন লেঠেলের পাগড়ী দেখলেই ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে পড়ত। লাঠির সে-তেজ এখন আর নেই। নচ্ছাড় ছোটলোকগুলোকে ঠাণ্ডা করতে আগ্নেয়াস্ত্র না হলে আর চলছে না বন্দুকের নল—হাঁ বন্দুকের নল চাই। সাপুড়েরা যেমন শিকড় দেখিয়ে বিষধর সাপকে বশীভূত করে তেমনি বন্দুকের নল দেখলে বাছাধনরা লেজ তুলে পালাবার পথ পায় না।

কমলকিরণ বলিল—তাই বলছি কি, মাঝে মধ্যে থানায় গিয়ে দেব-পূজার ব্যবস্থা করে আসবেন ম্যানেজারবাবু।

বজরা ঘাটে ভিড়িল। আরোহীরা নামিবার উদ্যোগ করিল। এই দিকের পাড় অন্যান্য ঘাটের তুলনায় অস্বাভাবিক রকম উঁচু। স্থানীয় লোকদের নিয়মিত যাতা-য়াতের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। অনায়াসেই ওঠা নামা করিতে পারে। ইন্দু ও আলেখ্যর পক্ষে একটু অসুবিধায়ই পড়িতে হইল। কমলকিরণ তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইল।

অমর নাথ হাটতলাকে তাহার কর্মকেন্দ্রগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছে। বাঁশ-খুঁটি সংগ্রহ করিয়া বেশ বড় সড় একটি শানের দোচালা তৈয়ারী করাইয়া স্বদেশী ক্যাম্প অফিস খুলিয়াছে। জায়গা জমিদারের। ঘর তৈয়ারীর বাঁশ' শান, দড়ি দড়া, সবই গ্রামবাসীরা সরবরাহ করিয়াছে। আর তাহাদের কায়িক শ্রমেই গড়িয়া উঠিয়াছে এতবড় একটি ঘর। তাহার যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড সুসংহত। একদিকে ছোট একটি অফিস, অপর দিকে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য নির্ধারিত স্থান। অফিস-ঘরের মাথার উপরে সুদীর্ঘ একটি বাশের মাথায় তেরঙ্গা পতাকা উড়িতেছে।

হাটে উপস্থিতি হইয়া ইন্দু সব কিছু ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবার অজুহাতে আলেখ্যদের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

আলেখ্য ও কমলকিরণ ব্রজবাবুর সহিত স্থায়ী কর্মচারী তারাপদর খোঁজে চলিল। তারপদ হাট সংলগ্ন জমিতে চালা বাঁধিয়া সপরিবারে বসবাস করে। সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে কাঁচা সব্জী হইতে শুরু করিয়া ভুসিমাল ও পাট প্রভৃতি হাটে ক্রয়-বিক্রয় হয়। তাহা ব্যতীত কিছু ছোট-বড় স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান রহিয়াছে। আরও আছে। হাট সংলগ্ন জমিতে, রাস্তার উভয় পার্শ্বে কতগুলি গুদাম রহিয়াছে। ইহাদের জন্য জমিদারের নিকট বন্দোবস্ত লইতে হয়। এইগুলির তদারকীও বুঝি তারাপদকেই একা করিতে হয়। তাহার প্রধান কাজ হইতেছে প্রতি হাটে অস্থায়ী দোকান ও

ভূসিমাল প্রভৃতি বিক্রেতাদের নিকট হইতে জমিদারের প্রাপ্য খাজনা আদায় করা।

ইন্দু হাঁটিতে হাঁটিতে স্বেচ্ছাসেবকদের অফিসের সামনে উপস্থিত হইল। অফিসের সামনে অপ্রশস্ত এক টুকরা জমি রহিয়াছে। সেইখানে দুই-তিনশত লোক অনায়াসে দাঁড়াইয়া বসিয়া সভায় সামিল হইতে পারে। ইন্দু অফিস-ঘরের কাছাকাছি যাইয়া দেখিল, অমরনাথ একটি টুলের উপর দাঁড়াইয়া মুখে টিনের চোঙ লাগাইয়া ভাষণ দিতেছে। তাঁহার দিনদিকে উৎসাহী শ্রোতারা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া। ইন্দু এক পা দুই পা করিয়া যথাসম্ভব অমরনাথের কাছাকাছি যাইয়া দাঁড়াইল।

অমরনাথ বলিতে লাগিল—আমরা সরাসরি কোন হাঙ্গামা হুজ্জুতির মধ্যে যাইতে চাই না। আমাদের আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে সাধ্য মত চেষ্টা করব। আমাদের লক্ষ্য হবে সততা, ন্যায় নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে সমাজের সার্বিক উন্নতি বিধানে প্রয়াসী হওয়া। সমাজের আর্ত, পীড়িত ও বঞ্চিতদের জন্য আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে, আয়াস বিসর্জন দিয়ে নিজে দুঃখকে হাসিমুখে মাথা পেতে নেবার মধ্যে আলাদা একটা আনন্দ আছে। পীড়িতের সেবা ক্ষুধার্তকে অন্নদান, ভগ্নোদ্যমের বুকে আশার সঞ্চার করা, কর্মহীনকে কর্মের সংস্থান করে দেয়া, শোকার্তকে সান্ত্বনা দিয়ে তার মধ্যে বেঁচে থাকার আগ্রহ জাগিয়ে তোলাই হবে আমাদের স্বেচ্ছা সেবকদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

স্বেচ্ছাসেবকগণ সমবেত কণ্ঠে পর পর তিনবার বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিল।

অমরনাথ আবার মুখের সামনে চোঙটি তুলিয়া লইল—আশা করি আপনারা অনেকেই জানেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত অতিথিদের পরিচর্যার দায়িত্বভার নিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। আবার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কথা যদি পর্যালোচনা করা যায় তবে বলতেই হয়, তারা মানুষের সেবাব মধ্য দিয়ে স্বধর্ম পালন করে থাকেন। ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টানরা আর্ত পীড়িতের মধ্যেই তাঁদের আরাধ্য দেবতার খোঁজ করেন। নিরাকার ব্রহ্মবাদীরা আর্তের সেবাকেই ধর্মের বিশেষ অঙ্গ জ্ঞান করেন। গৌতমবুদ্ধ মানব প্রীতিকে অগ্রাধিকার দেন, চৈতন্যদেব জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে প্রেম নিবেদন করেন। আর বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ও মহাত্মাগান্ধীর মানবপ্রীতির কথা আপনাদের ভালই জানা আছে।

স্বেচ্ছাসেবকগণ আবার সমবেতকণ্ঠে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে হাট প্রাঙ্গণ মুখর করিয়া তুলিল।

অমরনাথ আবার বলিতে লাগিল—কিন্তু বন্ধুগণ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ আজ জোয়ারের জলে গা-ভাসিয়ে আত্মসুখকে বড় করে দেখছে। দেশ ও দশের স্বার্থের দিকে তাকাবার তাদের অবকাশ কোথায়? কিন্তু দেশ ও দশের সেবা কি করে সম্ভব? গলা ছেড়ে চিৎকার করে বললেই দেশের মানুষের

উন্নতি সাধিত হবে না। কাজ চাই, কাজ জমিদারের কাছ থেকে আমরা আর নতুন কিছু আশা করতে পারি না। তারা প্রজার অধিকার খর্ব করে আর নিশ্চিত অধিকারের ক্ষমতা লাভ করে প্রজার সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক এমন কি যোগাযোগ পর্যন্ত রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাদের প্রসাদে গ্রাম আজ মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে। জমিদারদের বে-দরদী মনের নাগাল পাওয়ার আশা আমাদের ত্যাগ করে নিজেদের মেরুদণ্ডের ওপর দাঁড়াতে হবে। তবে একথাও ঠিক এ-ঋণ জমিদারের রইল। এরজন্য একদিন না একদিন তাকে জবাবদিহি করতেই হবে। হাজির হতে হবে জনতার আদালতের কাঠগড়ায়। পাওনা বুঝিয়ে দেবার সময় আর বহু দূরে নয়।

সমবেত জনতা সমস্বরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চারিদিক কাঁপিয়া তুলল। অমরনাথকে, তাহার মুখের কথাকে কাহারো ভুল বুঝিবার এতটুকুও অবকাশ নাই। এমন সুনিশ্চিত আশার ডালি লইয়া কঠিন-কঠোর সেবাব্রত লইয়া অবহেলিত প্রপীড়িত চিরবঞ্চিত মানুষগুলির পাশে দাঁড়াইয়াছে তাহাকে তাহারা ফিরাইবে কিসের সংকোচে, কোন বৃহত্তর আশার মোহে? যে অপরের দুঃখ—যন্ত্রণাকে হাসিমুখে বুক পাতিয়া লইয়াছে তাহাকে ফিরানো যে তাহাদের সাধ্যাতীত।

অমরনাথ এইবার বলিল—আমাদের পরিকল্পনার কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমাদের মত কৃষি অধ্যুষিত অঞ্চলে কৃষিকাজের পাশাপাশি ধ্বংসপ্রায় কুটীর শিল্পকে পুনরায় জীবিত করতে হবে। নতুবা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন অর্থ-কষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন রাস্তাই খোলা নেই, জানবেন।

এইবার কিছুক্ষণের জন্য বিরতি। অমরনাথ নামিয়া আসিল। আসরের কাজ কিন্তু বন্ধ হইল না। সাত-আটজন স্বেচ্ছাসেবক অগ্রসর হইয়া অমরনাথের কাছে গেল। তাহার নির্দেশে তাহারা চারণকবি মুকুন্দ দাসের একটি গান ধরিল—

"আয় রে বাঙ্গালী আয় সেজে আয়,
আয় লেগে যাই দেশের কাজে।
দেখাই জগতে ভেতো বাঙ্গালী
দাঁড়াতে জানে বীর সমাজে,
বহুদিন পরে ডাক এলো আজ
ওরে বাঙ্গালী সাজ তোরা সাজ,
এখনো নীরবে নাই কিরে লাজ
ধিক রে তোদের ক্ষত্রতেজে।
কোটি কণ্ঠে আজ জয় মা বলিয়া
দ্বেষ-হিংসা আদি চরণে দলিয়া

দাঁড়াবে বাঙ্গালী আপনা ভুলিয়া
সাজাই বাংলা নতুন-সাজে
মাভৈঃ ওঠার ও বাঙ্গালী-বীর
কতকাল রবি নত করি শির
শুনেছিলে জয় বাঙ্গালী জাতির
অনাহুতে শব্দ-ভেরীর মাঝে।"

গান শেষ করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ আবার নিজের জায়গায় চলিয়া গেল। এইবার ধীর মন্থর পায়ে অগ্রসর হইল একটি যুবতী। সুদর্শনা। অমরনাথের ভগ্নী সুলোচনা।

সুলোচনা ভাষণদানের জন্য টুলটির উপর উঠিল। মিষ্টিমধুর স্বরে ভাষণ শুরু করিল। উপস্থিত সুধীজন ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইয়া বলিল— এইমাত্র আপনারা শুনলেন, চারণকবি সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে উদাও আহ্বান জানাতে গিয়ে বলেছেন—

"কোটি কণ্ঠে আজ জয় মা বলিয়া
দ্বেষ হিংসা আদি চরণে দলিয়া
দাঁড়াবে বাঙ্গালী আপনা ভুলিয়া
সাজাই বাংলা নতুন সাজে,……"

বন্ধুগণ, বাংলাকে নতুন সাজে সাজাবার সুমহান ব্রত অন্তরে ধারণ করে আমাদের সমুখ পানে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে তাকাবার অবকাশ নেই। আমাদের অর্থবল নেই, কিন্তু জনবল আছে। অতএব আমার বিশ্বাস, প্রচেষ্টা মহৎ হলে অর্থের অভাব হয় না। দেশের মানুষ অর্থদান করতে অনাগ্রহী নয়। কিন্তু সে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে সমাজ গঠনের কাজে নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু কি সে কাজ? একটু আগে আপনারা শুনলেন, অম্বর চরকার কথা। আর তাকে কাজে লাগাতে হ'লে চাই তুলো। কি করে তুলোর অভাব পূরণ করতে হবে, তার সংক্ষিপ্ত আভাসও পেয়েছেন। এবার বলছি, ঘরে ঘরে তাঁত বসাবার পরিকল্পনার কথা। আমরা যতই চিৎকার করে বলি না কেন, বিলেতি কাপড় বর্জন কর, চটকদার কাঁচের চুড়ী, কাঁচের বাসন ও প্রসাধন সামগ্রী বর্জন করতে হবে। চারণ কবিও এর সমর্থনে সুন্দর একটা গান বেঁধে তার দেশপ্রেমিক মনের আর্জি জানিয়েছেন আমাদের কাছে। তিনি এক জায়গায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন—

"ঐ শোন বঙ্গমাতা সুধান কথা,
জাগো আমার শত কন্যা।
তোরা সব করিলে পণ, মায়ের এ-ধন
বিদেশে উড়ে যাবে না।

'আমি যে অভাগিনী কাঙালিনী
দু'-বেলা অন্ন জোটে না,
কি ছিলেম, কি হলেম, কোথায় এলেম
মা'কে তোরা চিনলি না।"

হ্যাঁ, আমাদের পণ করতে হবে, আমাদের কষ্টের ধন যাতে আর বিদেশে উড়ে না যায়। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? আমরা জানি আমাদের দেশ কুটিরশিল্পে সমৃদ্ধ ছিল একদিন। তার আমাদের সব চেয়ে বড় গর্ব ছিল বাংলার তাঁত শিল্পকে নিয়ে। কিন্তু স্বার্থগৃধ্নু বেনিয়ারা নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে আমাদের গর্বের তাঁত-শিল্পকে নির্মমভাবে গলা টিপে মারতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। তাঁতী ভাইদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দিয়ে চরম নির্লজ্জতার পরিচয় দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিলেতের কলে তৈরী কাপড়ে বাজার ছেয়ে দিল। আমরা তা দেখে আঙ্গুল হারাবার ব্যথা-বেদনা মুহূর্তে গেলুম ভুলে। আজ আমরা সে নির্লজ্জ কাজের প্রতিবন্ধকতা দানের ব্রত গ্রহণ করেছি। আপনাদের কাছে বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি বিলেতী কাপড় বর্জন করে দেশীয় তাঁতের কাপড় ব্যবহার করুন। কিন্তু পরিকল্পনাটিকে বাস্তবরূপ দিতে গেলে, দেশের মানুষের বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করতে গেলে চাই তাঁত শিল্পের উন্নতি সাধন। কিন্তু কি করে তার সার্থক রূপমান করা যেতে পারে? আমরা ইতিমধ্যেই চাঁদা তুলে কয়েকটি তাঁত কিনে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বসিয়েছি, আপনারা জানেন। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রচুর। এর জন্য চাই প্রচুর অর্থের যোগান। কিন্তু আমরা ভেবে দেখেছি, সমবায় সমিতি গঠন করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। পনেরো-ষোল জন সদস্য নিয়ে এক-একটি সমবায় সমিতি গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা। এদের কাজ হবে তাঁতের কাপড় উৎপাদন ও তার উৎকর্ষ সাধন। আবার সমবায় বিপনির মাধ্যমে উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয়ের সুবন্দোবস্তও করা যেতে পারে।

আর একটি শিল্পের কথাও আমরা ভেবেছি— মৌমাছি পালন। এটা এমন একটা শিল্প যার জন্য প্রচুর মূলধন নিয়োগ করতে হয় না। বাড়ির আনাচে কানাচে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী কয়েকটি কাঠের বাক্স বসিয়ে রাখলেই তাতে মৌমাছি আসা-যাওয়া করবে, মধু সঞ্চয় করবে। গ্রামে ফুল ও মুকুলের অভাব নেই যা মধুর উৎস। অতএব অন্যান্য কাজের ফাঁকে এ শিল্প পরিচালনার মাধ্যমে অর্থাগম সম্ভব। এ রকম আরও অনেক অর্থকরী কাজ রয়েছে, যা আমাদের এ গ্রাম্য পরি-বেশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। যেমন ধরুন গ্রামে প্রায় অনেকের বাড়িতেই ছোট-বড় পুষ্করিণী রয়েছে, আর আছে খাল-বিল-নালা। কিন্তু এদের অধিকাংশই কচুরি-পানার আশ্রয়স্থল। পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। না আছে এদের জল ব্যবহারের উপায়,না যায় মাছের চাষ করা। কেবলমাত্র মশার জন্ম ও বাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জলের চরম শত্রু কচুরীপানা ধ্বংস করে সেসব জলাশয়ে উন্নত প্রণালীতে

চাষ শুরু করলে মাছের চাহিদা পূরণ ত হবেই, দেশ থেকে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ সাধনও সম্ভব হতে পারে। আরও আছে, স্বল্প মূলধন নিয়োগ করে আমরা হাঁস-মুরগীর পোল্ট্রীও গড়ে তুলতে পারি। তবে এসব প্রকল্পকে বাস্তব রূপ দিতে হলে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা এ দিকটা যে ভাবি নি, তা-ও নয়। বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য পৃথক পৃথক প্রশিক্ষণের আয়োজন আমরা করেছি। বিশেষজ্ঞের দ্বারা সে—প্রশিক্ষণ-পর্ব পরিচালিত হবে। আমাদের অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতায় আমাদের পরিকল্পনাগুলো সার্থক হয়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

হাটের অন্যপ্রান্তে চলিতেছে বলশেভিক পন্থীদের সভা। তাহাদের সভাস্থলে লাল পতাকা উড়িতেছে। তবে সে সভায় জন-সমাবেশ তেমন হয় নাই। আসলে তাহাদের সাংগঠনিক কাজ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তাহারা অনুন্নত সম্প্রদায়, যেমন সমাজের অবহেলিত দুলে, বাগদী, সাঁওতাল প্রভৃতি পথের সাথী করিতে পারিয়াছে। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে তাহাদেব প্রভাব পড়ে নাই এমন কথা জোর দিয়া বলা যায় না।

সত্য কথা বলিতে কি, বলশেভিকরা এখনও তেরঙ্গা পতাকাবাহীদের মত জনমানসে এখনও তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বলশেভিকদের মূল নীতি হইতেছে, ধনতন্ত্রের শোষণবাদ অস্বীকৃত। আর ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা হরণ। মহাত্মা গান্ধী নন্-কোওপারেশন যেমন অমরনাথের ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া পেয়ে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। লাল পতাকার পূজারী বলশেভিকগণ মানুষের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে না পারলেও সমাজের অবহেলিত, শোষিত, নিপীড়িত মানুষকে ভিতরে ভিতরে সংগঠিত করিতেছে। বহু পতিত জমির সংস্কার সাধন করিয়া সেইখানে গৃহহীন দুলে, বাগ্দী ও সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মাথা গোঁজার সংস্থান করিয়া দিয়া তাহাদের অনেককেই লাল পতাকার নীচে আনিতে সক্ষম হইয়াছে। তবে সমাজের ধনীদের মধ্যে বলশেভিকদের প্রভাব লক্ষিত হইতেছে না। পাইবার আশা অপেক্ষা হারাইবার আশংকা নাকি ইহাতে প্রবল। তাই তাহারা আতঙ্কিত হইয়া লাল পতাকা হইতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত দূরে সরিয়া থাকিতেই বেশী আগ্রহী। ফলে আদ্রোহ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনকেই সমর্থন করে। স্বেচ্ছায় স্বদেশী তহবিলে প্রচুর অর্থ দান করিতেছে।

পনেরো

ইন্দু সত্যাগ্রহীদের সভা হইতে বাহির হইয়া আলেস্যদের খোঁজে হাঁটিতে লাগিল। সে অনুচ্চ কণ্ঠে মুকুন্দ দাশের একটি গানের সুর আওড়াইতে লাগিল,

"ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ী (রেশমী চুড়ী) বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না।
জাগো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না।

কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে
কলঙ্ক হাতে পরো না ;
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্মসাক্ষী
জগৎ ভরে আছে জানা।
চটকদার কাঁচের বালা ফুলের মালা
তোমার অঙ্গে শোভে না।
বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে
কোটি টাকার কম হবে না
পুঁত-কাঁচ ঝুটো মুক্তায় এই বাংলার
নেয় বিদেশী, কেউ জানে না·····"

ইন্দু আপন মনে গুণগুণ করিয়া গান গাহিয়া পথ চলিতেছে। এমন সময় পিছন হইতে কাহার যেন ডাক শুনিয়া সচকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘাড় ঘুরাইয়া পিছনে তাকাইতেই অমরনাথের স্ত্রী সুলোচনাকে দেখিতে পাইল। তাহার সহিত পূর্বে তাহাদের বাড়িতেই পরিচয় হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ বাক্যালাপও হইয়াছিল। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরিয়াই সভাস্থল হইতে তাহার খোঁজে ছুটিয়া আসিয়াছে। সুলোচনাকে দেখিয়া ইন্দু ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল।

সুলোচনা কাছে আসিয়া বলিল—আপনাকে সভাস্থলে দেখেছিলুম ঠিকই। ব্যস্ততার জন্য আলাপ করা সম্ভব হয় নাই। ভেবেছিলুম, আপনি আরও কিছুক্ষণ থাকবেন। সভার শেষে আপনার সঙ্গে কথা বলব। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, আপনি নেই। তাই ছুটতে ছুটতে এসে আপনাকে ধরলুম। হঠাৎ চলে এলেন যে, আমাদের সভা ভাল লাগল না বুঝি? দাদার সঙ্গে কথা না বলে চলে এলেন। দাদা খুব দুঃখ পাবেন।

ইন্দু লজ্জিত হইয়া উত্তর দিল—এমন করে চলে আসার জন্য আমিও কম দুঃখিত নই।

একাই এসেছেন, নাকি সঙ্গে কেউ আছেন?

না, একা নয়, আমার দাদা আর জমিদারকন্যা আলেস্যাও সঙ্গে রয়েছে।

তাই বুঝি? ওনারা কোথায়?

তা সঠিক বলতে পারব না।

সে কী কথা। এক সঙ্গে এসেছেন, ওনারা কোথায়, জানেন না?

ঠিকই বলছি। আসলে হাটে ঢুকেই আমি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। অনিচ্ছায় নয়, স্বেচ্ছায়।

সুলোচনা হাসিয়া বলিল—ব্যাপারটা বুঝলাম না।

তেমন কিছু নয়। ওনারা এসেছেন হাট পরিদর্শন করতে। হাটের কোথায় কি হচ্ছে, না হচ্ছে—আয় কেন কমে যাচ্ছে সেসব সরজমিনে তদন্ত করতে।

আপনি হঠাৎ তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন—

তাকে কথাটি শেষ করিতে না দিয়া ইন্দু বলিয়া উঠিল—ব্যাপারটা নিতান্তই আলেস্যার ব্যক্তিগত। তাছাড়া ওসব বৈষয়িক ব্যাপার স্যাপার আমার মাথায় ঠিক আসে না। উৎসাহও পাই নে। আসলে অপ্রয়োজনীয় স্থানে দূরে দূরেই থাকি।

মুচকি হাসিয়া সুলোচনা বলিল—বলুন, এটাই আসল কারণ, তাই না?

তাই হবে হয়ত। কিন্তু আপনি সভা ছেড়ে চলে এলেন যে?

সভার কাজ কিছু-সময়ের জন্য বিরতি। এই ফাঁকে আপনার খোঁজে ছুটে এলুম। মুহূর্ত কাল নীরবে কি যেন ভেবে এইবার বলিল—একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না—ত?

এত সঙ্কোচের কি আছে? কি কথা, বলেই ফেলুন। মুচকি হাসিয়া ইন্দু বলিল।

আপনি যে আমার সঙ্গে কথা বলছেন, আপনার দাদা বা আলেস্যাদেবী দেখতে পেলে অসন্তোষ প্রকাশ করবেন না—ত?

আপনার এরকম আশঙ্কার কারণ?

ওনারা আমাদের ত সুনজরে দেখেন না। সত্যি বলতে কি, আমাদের শত্রুই ভাবেন।

হয়ত তা-ই। আপনার কথা ঠিক হতেও পারে।

হয়ত বলছেন কেন? বরং বলুন অবশ্যই।

যাক, যে কথা জানতে চাইছেন, শুনুন, আপনার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখলে তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ কতখানি করবেন, জানি না। তবে সন্তুষ্ট যে হবেন না এটুকু অন্ততঃ নিশ্চিত করে বলতে পারি।

সুলোচনা ম্লান হাসিয়া বলিল—আমিও জানি। আচ্ছা, আপনার দাদা ও আলেস্যাদেবীর কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, আমাদের নন্-কোঅপারেশনের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি, দয়া করে বলবেন কি?

আলেখ্য সলজ্জভাবে উত্তর দিল—দেখুন সুলোচনাদেবী, বলতে লজ্জা নেই। নন্-কোঅপারেশনই শুধু নয়, রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই অস্পষ্ট। বাংলার বাইরে, পিতার কর্ম্মস্থলেই আমার এটুকু বয়স হয়েছে। বাড়িতে নিয়মিত একাধিক খবরের কাগজ আসত ঠিকই। কিন্তু আমি রাজনৈতিক কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে উদাসীন থাকায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেসব সংবাদও এড়িয়ে চলেছি। ফলে দেশের কোথায় কি ঘটছে, রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের কতটা অগ্রগতি হচ্ছে বা বিপ্লব কোনদিকে মোড় নিচ্ছে, কিছুই জানা ছিল না। এখানে, আপনাদের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হওয়ায় আমার চোখের ঠুলি খুলে গেছে। সত্য বলতে কি, আমার অবস্থা ছিল চোখ ঢাকা কলুর বলদের মত। আজ দেশের আন্দোলনের ব্যাপারে আমার ঔদাসিন্যের কথা স্মরণ করে নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে হচ্ছে।

বলতে লজ্জা নেই নন্-কোঅপারেশনের ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন ঝাঁপসাই রয়ে গেছে।

সুলোচনা ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল—আমি সংক্ষেপে নন্-কোঅপারেশনের সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করছি,—নন্-কোঅপারেশনের প্রকৃতি হচ্ছে—অহিংসা। শক্তি—নৈতিক বল ও ত্যাগ স্বীকার। মহাত্মা গান্ধী সুপ্তপ্রায় দেশবাসীকে সতর্ক-নির্দেশ দিলেন যে, আন্দোলনে অহিংসা ও সত্যের পথ অনুসৃত হবে। সত্যাগ্রহীবা হাসি-মুখে তাঁহার প্রবর্তিত শপথ গ্রহণ করল—আমরা এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, সংগ্রাম সত্যের পথ অনুসরণ করে চলবে। এবং ধন সম্পদ ও সম্পত্তি সম্পর্কিত সব রকম হিংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকব।

মহাত্মাজী সত্যাগ্রহীদের স্মবণ করিয়ে দেন, আত্মিকশক্তি সত্যাগ্রহীদের সব শ্রেষ্ঠ বল হিসেবে বিবেচিত হবে। দেশবাসীকে তিনি আরও উপদেশ দিলেন আত্মিক, শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আন্দোলনকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আমরা, মহাত্মাজীর অনুসরণকারী সত্যাগ্রহীরা সরকারের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে সেবামূলক কার্যের মাধ্যমে সমাজ-ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অন্যায় ও পাপ দূর করে শোষণহীন, সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে তোলার ব্রত পালনে আত্মনিয়োগ করেছি। অসহযোগ আন্দোলনের নীতি অনুযায়ী আমরা সরকারকে যে কোন রকম সাহায্য সহযোগিতা থেকে বিরত আছি। সরকাবী স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে টোলগুলিতে অধ্যায়ন শুরু করেছি। আব জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে শিল্প ব্যবস্থা প্রবর্তনেব কাজকে দ্রুততর করেছি। নবগঠিত আইন সভা বর্জনের মাধ্যমে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছি, ইংবেজদের আদালতের ত্রিসীমানায় কেউ যাই না, জনগণকেও না যেতে উৎসাহিত করছি। দেশ প্রেমিকরা দলে দলে রাজদরবার ত্যাগ করে আসছে। ঘৃণাভরে সরকাবী খেতাব পরিত্যাগ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বিলেতি কাপড় ও বিদেশী প্রসাধন সামগ্রী নিজেরা বর্জন করছি, দেশবাসীকেও বর্জন করতে উৎসাহিত করছি। দেশীয় চরকা ও তাঁত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে কাপড়ের চাহিদা পূরণের কাজে ব্রতী হয়েছি। ফলে দেশের অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে, সন্দেহ নেই।

কমলকিরণ ও ইন্দু জন্মাবধি পশ্চিমের বর্ধিষ্ণু শহরে বসবাস করিতেছে। পিতা মিঃ ঘোষ আইন-ব্যবসায় নিযুক্ত। ইহাতে তাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট রহিয়াছে। অর্থাগমও কম হয় না। পুত্র কমলকিরণকেও আইন পড়াইয়াছেন। বিলাত হইতে ডিগ্রী আনিয়া সে পিতার অধীনে আইন-ব্যবসায় নিযুক্ত। ইদানিং পিতা-পুত্রের যৌথ প্রচেষ্টায় চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবীকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। অর্থের কাঁধে ভর করিয়া মিঃ ঘোষের সংসারে আড়ম্বর বলতে যাহা যাহা বুঝায় এক এক করিয়া সবই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পারিবারিক ব্যাপারে

নতুন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে, তাহাকে বাস্তবরূপ দান করিতে অন্যান্য অধিকাংশ পরিবারের মত কাটছাঁট করিয়া অঙ্গহানি করিবার কথা ভাবিতে হয় না, প্রয়োজনও হয় না। প্রয়োজনের তুলনায় অর্থাগম অধিক হইলে সেইসব পারিবারিক আড়ম্বর এক-এক করিয়া দেখা দেয় মিঃ ঘোষের পরিবারে কোনটিকেই বাধা দিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। বরং মাত্রাহীন আড়ম্বরের মধ্য দিয়া পরিবারের সবার দিন কাটিতেছে। মিসেস ঘোষ অত্যন্ত বেশীমাত্রায় কৃত্রিম আর সভ্য মানুষের সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহার চেয়ে অনেক-অনেক বেশী কিছু তাঁহার প্রত্যাশা। সত্য বলিতে কি, কিসে যে প্রকৃত সুখ, আরাম ও শান্তি তাঁহার জানা নাই। পাওয়ার আনন্দ অপেক্ষা প্রত্যাশা অনেক বেশী।

সেইদিন অমরনাথের বাড়ি হইতে আসিবার পর হইতে আজ তাহার নন্-কোঅপারেশনের কার্যকলাপ দেখিয়া, সুলোচনার সহিত কথা বলিয়া এই আন্দোলনের প্রতি তাহার মনে যেটুকু বীতশ্রদ্ধভাব জাগিয়া ছিল সবকিছু ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সেদিন পাটনা শহরে তাহার বাবার মোটরের উইণ্ডস্ক্রিনটা ইঁট মারিয়া ভাঙিয়া দেয়ায় তাহাদের পরিবারের প্রত্যেকের ধারণা হইয়াছিল নন্‌কো-অপারেটরদের দ্বারাই এহেন জঘন্যতম কাজটি হইয়াছে। ইহার পর আন্দোলনের প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা থাকিবার কথা নয়। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে তাহার সেই ধারণা মন হইতে একটু একটু করিয়া মুছিয়া যাইতেছে। তাহার বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে তাহার বাবার মোটরে যাহারা ঢিল মারিয়াছিল তাহারা আর যা-ই হোক অন্ততঃ নন্-কোঅপারেটর নয়। যে কোন মহৎ প্রচেষ্টা ও সৎ আন্দোলনকে ভেঙে দিবার জন্য কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, জঘন্যতম কাজে প্রবৃত্ত হইতেও তাহাদের এতটুকুও বাধে না। মোটরের কাচ ভাঙার ব্যাপারটিও নিঘাৎ তাহারই পরিণতি।

রে-সাহেব আজ বৃদ্ধ। জমিদারি কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা আজ আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। যখন শারীরিক সামর্থ ছিল তখনও এমন কোন কাজের প্রতি তাহার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই যাহাতে গরীব প্রজার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। বরঞ্চ মাত্রাতিরিক্ত ঔদার্য ও মমত্ববোধের জন্যই নয়ন গাঙ্গুলির মত একাধিক অতিবৃদ্ধ অক্ষম ও অকর্মণ্যকেও তিনি বেতন দিয়া কর্মে নিযুক্ত রাখিতে কুণ্ঠিত হন নাই। জমিদারির আয় দ্রুত নিম্নাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে জানিয়াও অসহায় গরীব মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিয়া আত্মস্বাথ রক্ষায় উৎসাহী হইতে পারেন নাই। অসহায় আর্তজনের স্বার্থ তাঁহার দুর্বল ধর্মভীরু মন তাঁহাকে কোনদিনই নিষ্ঠুর হইতে দেয় নাই। ইহার জন্য আলেখ্য ও তাঁহার মা তাঁহাকে বৈষয়িক বুদ্ধিমান অকর্মণ্য অকালবৃদ্ধ বলিয়া তিরস্কার করিতেও দ্বিধা করে নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একমাত্র কন্যা আলেখ্যও যে তাঁহার বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উপর তিলমাত্র শ্রদ্ধা নাই এমন বহু বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

রে-সাহেব সে প্রজাদের গণদেবতা বলিয়া জ্ঞান করেন, আলেখ্য ও কমলকিরণ তাহাদের মানুষের মর্যাদা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে। তাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে কত রকম পরিকল্পনাই না করিতেছে। এমন কি জঘন্যতম প্রতারণার আশ্রয় নিতেও এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। একদিন জমিদারের লক্ষ্য ছিল প্রজাস্বার্থ রক্ষা করা ও প্রজাপালনে ব্রতী থাকা আজ সেইখানে প্রজাপীড়নই মূল লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এইসবে ইন্দুর এতটুকুও উৎসাহ নাই। প্রতিবাদ করিবার জন্য সর্বক্ষণই মন গুমড়াইয়া মরে, কিন্তু সম্ভব হইয়া ওঠে না। দুই-চারদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়া, আলেখ্যদের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহাদের কাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিলে বা প্রতিবাদ করিতে গেলে পরিণতি যে সুখকর হইবে না ইহাতে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়ে অমরনাথের অমায়িক আচরণ, চারিত্রিক দৃঢ়তা নিঃস্বার্থ প্ররোপকারব্রতী মনোভাব, দেশ ও দেশবাসীর প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা, আর্ত-পীড়িতজনের প্রতি ঐকান্তিক মমত্ববোধ ইন্দুকে মুগ্ধ করিয়াছে। সর্বোপরি তাহার অকৃত্রিম ও অমলিন সৌজন্যবোধের পরিচয় পাইয়া তাহার মনের গোপনকন্দরে প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিতেছে।

ষোল

আলেখ্য ও কমলকিরণ হাটের ইজারাদার তারাপদবাবুর সহিত কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ম্যানেজার ব্রজবাবুও তাহাদের সহিত আছেন। বার্ধক্য-জনিত কারণে তাহাদের সহিত পা-মিলাইয়া হাঁটিতে পারিতেছেন না। কয়েক পা পিছাইয়া পড়িয়াছেন। ছাতা-মাথায় তাহাদের পিছন পিছন হাঁটিতেছেন।

সুলোচনার সহিত ইন্দুকে আলোচনারত অবস্থায় আলেখ্য বা কমলকিরণ দেখিতে পাইয়াছে কিনা, বুঝা গেল না। দূর হইতে তাহাদের আসিতে দেখিয়া ইন্দুর মধ্যে কেমন একটি চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইল। তাহার এই আকস্মিক ভাবান্তরটুকু সুলোচনার নজর এড়াইল না। সে বিস্ময়, প্রকাশ করিয়া বলিল—কি ব্যাপার, হঠাৎ আপনার মধ্যে কেমন যেন একটু অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করছি।

ফ্যাকাশে-বিবর্ণ মুখে ইন্দু কহিল—আলেখ্যরা আসছে।

তাই বুঝি ? হাঁ, ঐ যে এদিকেই আসছে।

আগচ্ছমান আলেখ্যদের এক পলক দেখিয়া লইয়া সুলোচনা বলিল—আমি তবে যাই। অহেতুক আপনাকে বিপদে ফেলতে চাই না। কথা কয়টি বলিতে বলিতে সুলোচনা বিদ্যুৎগতিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সুলোচনা বিদায় লইলে ইন্দুও ব্যস্ত-পায়ে আলেখ্যদের দিকে হাঁটিতে লাগিল।

ইন্দুকে আসিতে দেখিয়া আলেখ্য তারাপদবাবুর সঙ্গে কথার ফাঁকে বলিল—তোমার ব্যাপারটা কি বল দেখি! সেই যে হাটে পা দিয়েই একটু ঘুরে আসছি

বলে কোথায় ডুব দিলে, সারাক্ষণ দেখা পেলুম না! ভাল না লাগলে বাবার সঙ্গে না নয় বাড়িতেই রয়ে যেতে।

ইন্দু ঠোঁট টিপিয়া হাসিয়া বলিল—তোমাদের পাশাপাশি কাছাকাছি না থাকতে পারার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু ভাল লাগছে না যদি মনেই করতুম তবে ত তোমাদের সঙ্গদানই করতুম। আসলে গ্রামের হাট সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। এখানে পা দিয়েই কেমন যেন চাঞ্চল্য, কেমন যেন এক অনাস্বাদিত আনন্দের মধ্যে পড়ে গেলুম। উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে হাটের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বার কয়েক ছুটোছুটি করে বেড়ালুম। তোমরা হয়ত ঐদিকটায় যাওনি দাদা? গিয়ে একবারটি দেখে এসো, কত কাঁচা সব্জী জড়ো হয়েছে। চাষীরা গরুর গাড়ী, মোষের গাড়ী বোঝাই করে করে ইয়া বড় বড় কুঁচকুঁচে কালো বেগুন, এই এত্তো বড় বড় কুমড়ো, লাউ— আরও কত রকম সব্জীর পাহাড়—

কমলকিরণ তাহাকে থামাইয়া দিতে গিয়া বলিল—থাক, আর বলতে হবে না। আমি দেখতে চাইনে। তোর যদি ইচ্ছে হয়, আব এক চক্কর মেরে আসতে পারিস। আদেখলা কোথাকার!

ইন্দু বুঝিল ওষুধে কাজ হইয়াছে। আলেখ্য বা তাহার দাদা কেহই তাহার দুরভিসন্ধিটুকু ধরিতে পারে নাই। অতএব প্রবঞ্চনার জন্য আর মিথ্যার আশ্রয় লইবার প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী তখন বিবেচনা করা যাইবে।

আলেখ্য আরও কিছুটা অগ্রসর হইয়া হাটের এক প্রান্তে একটি ঝাঁকড়া নিম-গাছের নীচে দাঁড়াইল। কিছু সময় বিশ্রামও লওয়া হইবে, তারাপদবাবুর সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও সারিয়া লওয়া সম্ভব হইবে।

তারাপদবাবু বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে জমিদারকন্যাকে সামনে সুস্পষ্ট একটি ছবি তুলিয়া ধরিলেন—মা-জননী, এই অমরপুর হাট জমিদারের কাছে কামধেনুতুল্য ছিল। জমিদারি আয়ের সিংহভাগ পূরণ করত হাটের আয়। কিন্তু কি যে ছাই অসহযোগের জোয়ার এল, সবকিছু একেবারে লণ্ড-ভণ্ড করে দিল। শোনলুম, ম্যানেজারবাবু স্বদেশী পাণ্ডাদের গুণ্ডামির উল্লেখ করে পর পর কয়েকটা চিঠিও দিয়েছিলেন। আপনারা এখানে পৌঁছেছেন তা-ও প্রায় সাতদিন গত হয়ে গেছে। জমিদার পক্ষের এই ঔদাসিন্য কিন্তু পরোক্ষভাবে আন্দোলনকারীদের দিয়েছে, অস্বীকার করার উপায় নেই। গুণ্ডাদের আক্রোশের শিকার বহু দোকানি। লক্ষ লক্ষ টাকার বিলেতি কাপড় পুড়িয়ে ছাই করে দিল, কাঁচের সৌখীন জিনিষপত্র ও বিলেতি প্রসাধন সামগ্রী ভেঙেচুরে তছনছ করে দিলে! জমিদারি আয় কমার একটা বড় কারণ এটা। শুধু কি তাই? হাটের প্রায় সব বিক্রেতাই জমিদারকে খাজনা না দিয়ে সেই অর্থ স্বদেশী ফাণ্ডে জমা দিচ্ছে। স্বদেশী গুণ্ডারা ঘন ঘন হুমকী দিতেও ছাড়ছে না ধর্মঘটের ডাক দেবে। তহবিল শূণ্য হতে হতে আজ চরম পর্যায়ে

এসে দাঁড়িয়েছে! খবর পেয়ে জমিদারবাবু ছুটে এলেন। কিন্তু তিনি এসেও অচলাবস্থা অবসানের জন্য সক্রিয় হলেন না।

আলেখ্য বলিল—বাবা নিষ্ক্রিয় আছেন, স্বীকার করছি। কিন্তু আমি ত এখানে পা দেবার পর থেকে এক মুহূর্তও হাত গুটিয়ে বসে নেই, আশা করি অস্বীকার করতে পারবেন না তারাপদ কাকা।

অস্বীকার করছি না। তুমি এসে নিজে হাতে হাল ধরেছ বলেই না অচল অবস্থার কিছুটা অন্ততঃ পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছ। কিন্তু কার সাহায্য নেবে? যে সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়াবে ভূত যে আগেভাগে তার মধ্যেই ঢুকে বসে রয়েছে মা জননী। পরিস্থিতি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গোচর করলে। ফল কি পেলে? এইবার অদূরবর্তী ঝাঁকড়া নিম-গাছের নীচে বিশ্রামরত চার-পাঁচজন পুলিসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলিলেন—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তোমার আবেদন পেয়ে এদের পাঠিয়ে দিলেন। সকালে হাটে এসে দেখেছ, সবাই মৌজ করে বসে খইনি টিপছে আর পা ছড়িয়ে বসে খোস গল্প করছে। এখনও তেমনি খইনি টিপে চলেছে দেখছ? আর হাটের মধ্যে একদিকে মহাত্মা গান্ধীর পোষ্যপুত্রের ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিটিং চালাচ্ছে আর বন্দেমাতরম্ ধ্বনীতে আকাশ কাঁপাচ্ছে। শুধু কি তা-ই? অন্য আর এক প্রান্তে লাল ঝাণ্ডাবাহী বলসেভিকের দল গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, দেশে মেহনতী মানুষের রাজ্য গড়বেই। দেশে ধনী-দরিদ্রের কোন বৈষম্য রাখবে না। মুড়ি-মুড়কি এক দর করে ছাড়লে!

আপনি মিছেই হতাশ হচ্ছেন তারাপদকাকা।

হতাশ হব না, বলছ কি? নচ্ছাড়গুলোর স্পর্ধা দেখলে গা জ্বলে যায়! ধনীদের ওপর তাদের যত আক্রোশ! ধনীদের কথা সর্বস্ব নিয়ে গরীবদের পেট ভরানোর রাজনীতি শুরু করেছে জীন্দাবাদের দল! একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর! একেই স্বদেশী গুণ্ডাদের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত! তার ওপর আবার শুরু হয়েছে বলশেভিকপন্থীদের দৌরাত্ম। স্বদেশীরা আবার গ্রামে গ্রামে নাইটইস্কুল প্রতিষ্ঠা করছে। পড়াশুনা ত হয় গুষ্টির পিণ্ড।

লেখা-পড়ার নামে গরীব চাষাভুষোগুলোকে নন-কোঅপারেশনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে শোনানো হয়। যত্তসব অনাসৃষ্টি গুণ্ডামি শুরু হয়েছে মা জননী! দেশোদ্ধারের নামে সবকিছু একেবারে ছারখার করে ছাড়লে!

আলেখ্য বলিল—ম্যাজিস্ট্রেটকে দরখাস্ত করেছিলুম। তিনি পুলিশ পাঠিয়ে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন মিথ্যে নয়। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা বা বলসেভিকরা কেউই আজ অপ্রীতিকর কাজে প্রবৃত্ত হয়নি। ফলে তাদের অলসভাবে গল্প করেই কাটাতে হল তারাপদকাকা। আর নাইট ইস্কুলের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। নিরক্ষর মানুষগুলোকে স্বাক্ষর করার কাজকে আর দশজনের কাছে অন্যায়-অপরাধ বলে তুলে ধরা যায় না। তবে আমি গোপনে তাদের কার্যকলাপের ওপর নজর রেখে চলেছি।

এইবার দৃঢ়তার সহিত বলিল—দেখুন তারাপদকাকা, বাবা সহজ-সরল-নিরীহ মানুষ। আমি কিন্তু মোটেই তাঁর মত মাটির মানুষ নই। তবে আর আমার আসার প্রয়োজন কি ছিল? এদের নন্-কোঅপারেশনই বলেন আর বলশেভিক কার্যকলাপই বলেন ভাল কি মন্দ আমার ঠিক জানা নেই, জানার প্রয়োজনও বোধ করি না। যদি ভাল হয়, তবু আমার উৎসাহ নিরুৎসাহ কোনটাই নেই। কিন্তু প্রজারা আমার। আমার জমিদারি আয়-ব্যয় বা সাংসারিক ব্যাপারের সঙ্গে সংঘাত লাগিয়ে দেয়ায় আমার যত আপত্তি। জমিদারি কার্যকলাপে পুলিসের নাক গলানোর ব্যাপারটা মোটেই আমার মনঃপুত নয়। কিন্তু আমার হাত-পা বেঁধে দিয়ে সেদিকে আমাকে ঝুঁকতে বাধ্য করে। আমি অসহায়, বাস্তবিকই একান্তভাবে অসহায় করে তুলেছে আমাকে।

হাত কচলাইয়া তারাপদবাবু বলিলেন—কিন্তু আন্দোলনকারীরা যদি বলে আমরাই অন্যায় করছি?

ন্যায়-অন্যায় বোধটা সবার দৃষ্টিতে সমান না-ও হতে পারে, স্বীকার করছি। আর এরই ফলে সংঘাত বেঁধে থাকে এ-ও আমার অজানা নয়। কিন্তু আমি দেখব আমার স্বার্থ কিসে বিঘ্নিত হচ্ছে।

তারাপদবাবু পূর্বের শান্ত সমীহভাবটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিলেন—হাটে পুলিসীহানার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে সত্যাগ্রহীদের মধ্যে চাপা ক্রোধের সঞ্চার করেছে। ব্যবসায়ীরাও ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখে নি।

তাই বলে আমার জমিদারিকে এমনিভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে আর আমি পুতুলের মত নীরব দর্শকের ভূমিকা নেব। এ হতে পারে না—অসম্ভব। এতদিন আমার বাবার হাতে জমিদারির দায়িত্ব ছিল, আজ আমার ওপর সে দায়িত্ব বর্তেছে। জগতে যোগ্যতাটাই সাফল্য ও ব্যর্থতার একমাত্র মাপকাঠি, অদ্বিতীয়। অযোগ্যের একমাত্র অবলম্বন শত্রুর সঙ্গে সমঝোতা ও কারণে অকারণে ক্ষমা ও শান্তির বুলি আওড়ানো। বাবার চারিত্রিক দুর্বলতার সঙ্গে আমাকেও যদি একই দাড়ি পাল্লায় মাপতে চায়, চরম ভুল করবে। আমার বাবার পুরুষোচিত শক্তিহীনতা, চিত্তদৌর্বল্য, মানসিক দৃঢ়তার অভাব আর মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমাশীলতাই তাঁর আজকের পতনের মূল। আমি উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারির স্বত্ব লাভ করতে চলেছি, কিন্তু তাঁর চিত্তের দুর্বলতাটুকু বাদ দিয়ে। ধনীদের সম্পদ লুটে পুটে দরিদ্র হাভাতেদের পাইয়ে দেয়াকে অন্যে যা-ই বলুক না কেন, আমি অন্ততঃ তাকে মহৎ প্রচেষ্টা বলে মেনে নিতে পারছি না, পারবও না কোনদিন। যে আন্দোলন ধনীদের সর্বস্ব হরণ করে দারিদ্রের অন্নের সংস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমি অন্ততঃ তাকে সাধুবাদ জানাতে পারব না।

প্রজারা যদি এটাকেই একমাত্র মহৎ কাজ বলে মনে করে তবে সে জোয়ারের জলকে বাঁধা দেবে কি করে মা জননী? আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এ জগতে কারো পক্ষে এককভাবে চলা সম্ভব নয়—

কেন শক্তি-সামর্থ্যের অভাবে ?

শক্তির অভাবের কথা বাদ দিলেও প্রবৃত্তির অভাবকেও ত আর অস্বীকার করা যাবে না।

তারাপদ কাকা প্রবৃত্তির কথা না হয় প্রযোজনে পরে ভাবা যাবে। আর শক্তির কথা যদি বলেন, আমি আশ্বাস দিচ্ছি শক্তির অভাব ঘটবে না। আমি কালই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে হাট চত্বরে নিয়মিত পুলিসী চৌকির ব্যবস্থা করছি। আপনি মেরুদণ্ড সোজা করে কর্তব্য সম্পাদন করে যান। কথা কয়টি কোন রকমে শেষ করে আলেখ্য সোজা খেয়া-ঘাটের দিকে হাঁটিতে লাগিল। কমল-কিরণ কয়েক হাত দূরে তার ছোট-বোন ইন্দুর সঙ্গে গভীরভাবে কি যেন আলোচনা করছে দেখা গেল। আলেখ্যর ডাকে তারা সচকিত হইয়া তাকে অনুসরণ করিল।

সতেরো

৫ আলেখ্য বজরায় উঠিয়া বিষণ্ণমুখে এক কোণে বসিয়া রহিল। কমলকিরণ আর ইন্দুর মনেও বিষাদের কালো ছায়া। কারো মুখে টু-শব্দটি পর্যন্ত নেই।

বৃদ্ধ ম্যানেজার ব্রজবাবু তাদের ব্যাপারে নির্বিকার। বজরায় উঠিবার সময় অসাবধানতা বশতঃ তাহার চটিজোড়ায় কাঁদা জড়াইয়া গিয়াছিল। একটি কাঠির সাহায্যে তাহা পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। অন্য কোন দিকে তাহার মন ও কানকে নিযুক্ত অবকাশ কোথায়।

ইন্দু ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অমরনাথের নন্-কোঅপারেশনের কার্যকলাপ তাহার মনে সে ছায়াপাত করিয়াছে তাহা তাহার দাদা কমলকিরণ কৌশলে তাহার মুখ হইতে শুনিয়া লইয়াছে।

আলেখ্য যে কিছুক্ষণ আগে অমরনাথের বোন সুলোচনার সহিত একান্তে বাক্যালাপ করিতেছিল তাহা কমলকিরণ দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছে। তবে সুলোচনাকে সে চিনে না। আগে পথে ঘাটে কোথাও দেখিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সে যে অমরনাথের বোন জানা না থাকায় বিশেষভাবে চিহ্নিত করা কোনদিন সম্ভব হয় নাই। আজও সে বুঝিতে পারিত না যদি ইন্দু তাহার পরিচয় গোপন করিত। ইন্দুও ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব দেয় নাই। অমরনাথের সহিত মেলামেশা করিলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে তাহা সমালোচনার ব্যাপার হইতে পারিত বটে। কিন্তু তাহার বোনের সহিত দুই-চারটি কথা বলিতে দেখিলেই সে তাহার দাদা এমন করিয়া জেরা করিতে উৎসাহী হইবে, ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে পারে নাই। জেরার চাপে পড়িয়া তাহার পক্ষে অন্য কাহারো কথা বলিয়া প্রসঙ্গটিকে চাপা দেয়া সম্ভব হয় নাই। তবে সুলোচনার সহিত তাহার পরিচয়ের সূত্র সম্বন্ধে একটু মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। আলেখ্যর কাছে ও সে বলে নাই যে, কয়দিন আগে তাহার বাবা রে-সাহেবের নির্দেশে সে সেদিন বিকেলে অমরনাথের বাড়ি গিয়াছিল। আসলে

আলেখ্য বা কমলাকিরণ কেহই জানিত না যে, সুলোচনা রে-সাহেবের সহিত বিদ্যা-সুন্দর ভট্টাচার্যের বাড়ি গিয়াছিল। রে-সাহেব তাঁহার অসুস্থ বাল্যবন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইবেন, তাহারা শুধুমাত্র এইটুকুই জানিত। তাহার পর কি ঘটিয়াছিল তাহা তাহাদের আগোচরই ছিল। দীর্ঘ সময় বাড়িতে ইন্দুর অনুপস্থিতির কথাও তাহাদের অজ্ঞাতই ছিল। সত্য বলিতে কি এইদিকে নজর দিবার অবকাশ আলেখ্য বা কমলাকিরণ কাহারও ছিল না। তাহারা তখন ম্যানেজার ব্রজবাবুকে লইয়া জমিদারি পরিদর্শনের জন্য ম্যাপ তৈয়ারীর কাজে আত্মমগ্ন ছিল। কোথায় কি ঘটিতেছে নজর দিবার ইচ্ছা বা অবকাশ কোনটিই তাহাদের ছিল না।

আজ কমলাকিরণ যাহাই বলুক, ঘটনাটিকে যে-দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করুক, সেদিন বৈকালে ইন্দুর অমরনাথের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটি ছিল নিছকই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। সম্পূর্ণ অকল্পনীয় পরিস্থিতির ফলেই তাহাকে অমরনাথের টোলে পরে তাহার বাড়ি পর্যন্ত যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু সেইদিনের সুন্দর বৈকালটি তাহার নিকট যে এমন করিয়া শত গুণ উপভোগ্য হইয়া উঠিবে সে নিজেও সেইখানে পা দিবার আগে ভাবিতে পারে নাই। অমরনাথকে সে আলেখ দেব বাড়িতে ইহার আগেও দুই-তিনবার দেখিয়াছে। টুকরা টুকরা কথাবার্তাও কিছু শুনিয়াছে। তাহার নির্ভিকতা ও পরোপকার মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রথম অমরনাথের বাড়িতে পা দিয়া, তাহার সহজ-সরল নিরভিমান আচরণ ও ব্যথিত-আর্তের জন্য তাহার মনের নিখাদ আর্তি আর সততা ও ন্যায়-পরায়ণতার ছোঁয়া পাইয়া তাহার বংশ-মর্যাদা বনেদী আভিজাত্যের দম্ভটুকু অনায়াসেই ম্লান হইয়া গিয়াছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে সবিস্ময়ে ভাবিয়াছিল, নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক আত্মসুখ বিমুখ একটি যুবক পরতাপ হরণের ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। আজকের স্বার্থপর মানুষের মেশায় এমন একটি নিরাসক্ত পরোপকার ব্রতী মানুষ দ্বিতীয়টি খুঁজিয়া পাওয়া ভার। আজ অমরপুরের হাটে গিয়া যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিল তাহাও বাস্তবিকই অকল্পনীয়। চাষী মজুর হইতে শুরু করিয়া হাটের প্রায় প্রতিটি ব্যবসায়ী অমরনাথের সহিত হাত মিলাইয়াছে। তাহাকে অতিমানব কল্পনা করিয়া নির্দ্বিধায় অনুসরণ করিতেছে। কিসের মোহে, কিসের আশায় ?

কমলাকিরণ ও আলেখ্য তাহাকে দুই চক্ষু পাতিয়া দেখিতে পারে না। আলেখ্যর বদ্ধমূল ধারণা, অমরনাথ তাহাদের পরিবারের বিরুদ্ধে, তাহাদের জমিদারির বিরুদ্ধে লেংটিসার সন্ন্যাসী গান্ধীজীর ভেক ধরিয়া তলে তলে ষড়যন্ত্র করিতেছে। আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায় লইয়া কুটিল পথ ধরিয়াছে। আলেখ্য পরিষ্কারই বলিয়া থাকে, অমরনাথের একমাত্র উদ্দেশ্য যেকোনভাবে জমিদারিটি ধ্বংস করিয়া তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য অমরনাথ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাহার বাবা রে-সাহেব চিরদিনই সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ। কুটিল মানুষের বাঁকা পথ বুঝিতে পারেন না। ইন্দুকে

তিনি সেইদিন অমরনাথের চতুষ্পাঠীব ঠিকানা দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, অমরনাথকে একবারটি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুবোধ করিতে। সাহেব প্রথম দর্শনেই অমরনাথের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের যে বিশেষ ছাপটুকু আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আলেখ্যর ভাষায় তাহা নিছকই বুদ্ধিহীনতা, বৈষয়িক ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার ও মানুষ চিনিবার অক্ষমতা ছাড়া কিছু নয়। আলেখ্য প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই বুঝিয়াছে তাহাদের জীবনে অমরনাথ সাক্ষাৎ রাহু হইয়া দেখা দিয়াছে। জমিদারির সর্বনাশও তাহাদের সর্বশান্ত করিবার কু-মতলব লইয়া সে প্রতিনিয়ত ভাবিত। আর কমলকিরণ? সে ত কথায় কথায় বলে লোকটি স্বদেশী-পাণ্ডা! ভণ্ডামি ভালই জানে। নন-কো অপরেশনের দোহাই দিয়া, তেরঙ্গা পতাকার ছায়ায় থাকিয়া স্ব-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সদা ছোঁকছোঁক করিতেছে। সুযোগ পাইলেই বড়রকম কামড় বসাইবে। ব্যাস, তাহার পরই দেশোদ্ধারের কাজ হইতে গুটি গুটি গা-ঢাকা দিবে। খলের ছলের অভাব হয় না।

কমলকিরণ ও ইন্দুর আকস্মিক নীরবতাটুকু আলেখ্য বা ব্রজবাবু কাহারো নজরে পড়িল না। তারাপদবাবুর কথাগুলি এখনও তাহার বুকের ভিতরে অনবরত পাক খাইয়া বেড়াইতেছে। গুলি-খাওয়া বাঘিনীর মত সে ভিতরে ভিতরে ফুঁসিতেছে। সামান্য এক গ্রাম্য ব্রাহ্মণ-সন্তানের স্পর্ধা তাহার গায়ে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। সাক্ষাৎ অভিশাপ হইয়া যেন দাঁড়াইয়াছে। যাহাকে সহ্য করা যায় না তাহাকে শায়েস্তা করিতে গেলে অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিতে হয়, আলেখ্যর অজানা নয়। কিন্তু এ যে সহ্যের চরম সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। দিন-দিনই দুর্বিনীত দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে। অসীম সাহসের সহিত যদি প্রবঞ্চনা দোসর হয় তবে তা কঠিনতর সমস্যা হইয়া দেখা দেয়। অমর নাথেব প্রবঞ্চক মনের পরিচয় প্রথম দর্শনের মুহূর্তেই আলেখ্য পাইয়াছিল। নইলে একে ব্রাহ্মণ সন্তান, তাহার উপর একজন টোলের অধ্যাপক হইয়াও সে তাহার কায়স্থ-বাবার পায়ে মাথা ঠুকিতে যায়। সেখানে এখন মাত্রাহীন ভক্তি তাহাতে ছল চাতুরির গন্ধ থাকিতে বাধ্য।

সমস্যা বহু। আলেখ্য তাহার পিতার নিকট হইতে জমিদারির অলিখিত দায়িত্ব পাইয়াছে বটে। কিন্তু তাহার গতি বিধির উপর যে তাহার পিতা অতন্দ্র প্রহরীর মত সর্বদা নজর রাখিয়া চলিয়াছেন, খুবই সত্য। ননু-কোঅপারেশনের তকমা-আঁটা অমরনাথের প্রতি যে একটু বিশেষ দুর্বলতা রহিয়াছে তাহা তাহার কথার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। অমরনাথের প্রসঙ্গ উঠিতেই তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিলেন—অমরনাথ এক অসাধারণ যুবক. এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা। তাহার অসাধারণত্ব কোথায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। দেশে লোকের কাছে একদিন সে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে। সবাই তাকে মাথায় তুলে নাচছে, আমার কথা মিলিয়ে নিয়ো।

রে-সাহেবের ঐকান্তিক ইচ্ছা, আলেখ্য আর যেই দিক দিয়া জমিদারির উন্নতি

করিতে চায় করুক, আপত্তি নাই। কিন্তু এমন কোন কাজে যেন কখনই প্রবৃত্ত না হয় যার ফলে অমরনাথের সহিত প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে জড়াইয়া পড়ে।

আলেখ্য আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পিতার অগোচরেই ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত যোগাযোগ করিয়া হাটে পুলিস-চৌকির ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু গান্ধীজীর ভেকধারী স্বদেশী পাণ্ডা অমরনাথ তাহাকে হতাশ করিয়াছে। এত তোড়জোড়, এত আয়োজন সবই ব্যর্থ করিয়া দিল। নিরীহ-নম্রভাবে মিটিং-মিছিল পরিচালনা করিয়াছে। তাহার চেলাচামুণ্ডারাও ততোধিক মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়াছে। এমনই দুর্ভাগ্য যে কোন দোকানির মধ্যেই বিলেতি কাপড় বা বিলেতি সৌখীন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ের সামান্যতম আগ্রহও দেখা যায় নি। ব্যাপারটি এমন দাঁড়াইয়াছে যেন আলেখ্যকে অপদস্থ করিতে তাহার আয়োজন-উদ্যোগ ব্যর্থ করিয়া দিতে দোকানিরা অমরনাথের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে, সাময়িক সন্ধি করিয়াছে। সারাদিন রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিয়া আলেখ্য এমন কোন অজুহাত পাইল না যাহাকে কেন্দ্র করিয়া হাটে অশান্তি বাঁধাইয়া অমরনাথকে পুলিস দিয়া শায়েস্তা করিতে পারে। কিন্তু সারাদিন অমরপুরের হাট খোলায় নিরুত্তাপ বিরাজ করায় আলেখ্যকে কম অপদস্থও হইতে হইবে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে মুখ রক্ষাই দায় হইয়া পড়িবে। ভবিষ্যতে আবার সাহায্য চাহিলে তাঁহার দিক হইতে কতটুকু সাড়া পাওয়া যাইবে, ভাবিবার বিষয় বটে।

হাটের ইজারাদার তারাপদবাবু বিদায় মুহূর্তে আলেখ্যকে বলিয়াছিলেন বটে, হাট-চত্বরের বাহিরে একদল সত্যাগ্রহী অপেক্ষা করিতেছে। নিশ্চয়ই অহেতুক বসিয়া নাই, বদ মতলব আঁটিতেছে। সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে। আবার লাল পতাকা-বাহী বলশেভিকরাও ভিতরে ভিতরে ফুঁসিতেছে। সশস্ত্র পুলিস হাট ছাড়িয়া গেলেই তাহারা হয়ত হাঙ্গামা বাঁধাইবে। আর কিছুক্ষণ থাকিয়া গেলে আলেখ্যর পক্ষে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত।

আলেখ্য ও কমলকিরণের পক্ষে ইজারাদার তারাপদবাবুর কথায় আস্থা স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। তবে বিদায় লইবার পূর্বে এইটুকু অন্ততঃ লেঠেলদের মোতায়েন করিয়া দিয়া আসিয়াছে। আর তাহাদের বার বার সতর্ক করিয়া আসিয়াছে, তাহারা যেন হাটের বিশেষ বিশেষ স্থানে আত্মগোপন করিয়া থাকে। নন্-কোঅপারেটর বা বলশেভিক করাই হাটের শান্তিভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবে অতর্কিতে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। প্রয়োজনে বেধড়ক লাঠি চালাইতেও যেন দ্বিধা না করে। দুই-চারটি মাথা ফাটিয়া গেলেও ঘাবড়াইবার কারণ নাই। থানা-পুলিস কোর্ট-কাছারি করিতে হইলে সে-ই ঝাক্কি পোহাইবে।

আঠারো

এতদিন তাও এক রকম চলিতেছিল! জমিদারি পরিদর্শন ও অমরপুরের হাট হইতে ফিরিবার পর আলেখ্যর দুশ্চিন্তা যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। তাহার

উপস্থিতিতে যদিও হাট চত্বরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। ইহা যেন তাহার নিকট একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। যাহাই হউক অশান্তি কিছু ঘটিলে বন্দুক ও লাঠির সাহায্যে নন্-কোঅপারেটরের পাণ্ডাদের একটু শায়েস্তা করিয়া মনের ঝাল মিটাইতে পারিত। অপদার্থ সত্যাগ্রহী বা লালপতাকাধারী বলশেভিকরা সেই সবের ধার কাছ দিয়াই গেল না। শান্তিপূর্ণ পিকেটিং ও সভা করিলে আন্দোলনকারীদের উপর প্রতিশোধ লইতে প্রবৃত্ত হইবে কিসের অভিযোগে, কোন অজুহাতে? তবে অমরনাথের ভাষণে উত্তেজনা ছিল. কিন্তু প্ররোচনা ছিল না। জমিদারের ব্যর্থতা ও অকর্মন্যতার উল্লেখ করিয়া অমরনাথ যাহা কিছু বলিয়াছে তাহা জ্বালাময়ী হইলেও এতটুকু মিথ্যার আশ্রয় লয় নাই, খাদ মিশাইবার মিথ্যা চেষ্টা হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে। আবার লালঝাণ্ডার নীচে যারা সমবেত হইয়াছে সেইসব বলশেভিকরাও মিথ্যা উত্তেজনা ছড়াইবার চেষ্টা করে নাই। দুর্দশাগ্রস্ত নিরীহ প্রবঞ্চিত চাষী-ভূষোদের তাহাদের পতাকাতলে আনিবার জন্য নিজেদের নীতির কথা সভা-মিছিলের মাধ্যমে প্রচার করিতেছিল। এই ধরণের পতাকাধারীর নীতি ও উদ্দেশ্য ভিন্নতর হইলেও জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার সময় তাহাদের সাদৃশ্য প্রকট হইতে দেখা যায়। খাজনা বন্ধের ব্যাপারে যেমন উভয়ে একই মত ও পথের সাথী, জমি-দারের সৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে লক্ষিত হয় পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া চলিতেছে, যেন পরস্পর হরিহর আত্মা।

সেদিন হাটে উত্তেজনা ছিল না বলিলে সত্যের অপলাপই করা হইবে। অ-স্বাভাবিক গুমোট হাওয়া বহিতেছিল। সত্যাগ্রহী বা বলশেভিকরা অন্তরের অন্তঃ-স্থলে চাপা উত্তেজনার জোয়ার বইছিল। সবাই যেন চাপা ক্রোধে ফাটিয়া পড়ার উপক্রম হইতে ছিল। আলেখ্য যার পরনাই বিস্মিত হইয়াছে আন্দোলনকারীদের অসাধারণ ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখিয়া। আর একটি ব্যাপার আলেখ্যর নজর এড়ায় নাই, তাহাব অধিকাংশ প্রজা দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিবার দলে. অসহযোগ বা বলশেভিক কোন আন্দোলনের প্রতিই তাহাদের মনের দিক হইতে উৎসাহ নাই। সে আজ হাটে গিয়া প্রজাদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলিয়া, পিকেটিং ও সভার পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া ব্যাপারটি পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, সে এতদিন মূর্খের স্বর্গে বাস করিত। অন্তরের অন্তঃস্থলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের মিথ্যা প্রয়াস চালাইয়াছে। প্রজারা নিজক মজা দেখিবার জন্য সভা-মিছিলে যায় না। তাহাদের বুকে জাগরণের জোয়ার আসিয়াছে। এতদিন তাহাদের নিকট তেরঙ্গা পতাকা ও লাল পতাকার আদর্শ ও নীতির মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বুঝিত না। ইহা লইয়া মাথা ব্যথাও ছিল না। আজ মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, ইহাদের কার, কি রূপ। কে কোনদিক হইতে দেশ ও দশের পরিবর্তন সাধন করিতে আগ্রহী। কথার চটকদার ফুলঝুড়ি আর লম্বা লম্বা ফিরিস্তি দেখিয়া আজ আর ভাব ভুলিবার নয়। সত্য, ন্যায় ও নীতির কষ্ঠিপাথরে ঘষিয়া সাজিয়া যাচাই

করিয়া লইতে জনগণ আজ উন্মুখ হইয়াছে। তাই স্বীকার করিতেই হয় দেশের বুকে যে জাগরণের জোয়ার আসিয়াছে, প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে তাহা হইতে কেহই দূরে সরিয়া থাকিবে না। আলেখ্য ইহা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিতেছে।

কিন্তু এই ব্যাপারে অন্ততঃ নিঃসন্দেহ হইয়াছে, স্বদেশী-ভেকধারী গুণ্ডারা কিছুতেই আর হাট চালু রাখিতে দিবে না। পর পর কয়েকটি হরতাল করিয়াছি। এখন আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্য হাট বন্ধের ডাক দিয়াছে। এতদিন ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণ একটি দিশাহারা অবস্থার মধ্যে ছিল। স্বদেশীরা কি চায়, সত্যই কোন মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা লড়িতেছে, নাকি সবই ভাওতবাজী? সত্য বলিতে কি, জনগণ বিচার-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়া একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারিয়াছে। ভবিষ্যতে সাফল্য বা ব্যর্থতা যাহাই আসুক না কেন স্বদেশীদের কথা ও কাজে কোন ফাঁক নাই। দেশের বুকে একটি উত্তেজনার জোয়ার প্রবাহিত করিয়া নিজেদের স্বাথের গুছাইয়া পাইবার দুরভিসন্ধির গন্ধ অন্ততঃ এখন পর্যন্ত পায় নাই। সর্বদিক বিচার-বিবেচনা করিয়া তাহারা আন্দোলনের পথকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, পতাকাতলে সামিল হইয়াছে। তাহাদের যত ক্ষতিই হউক, যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতেই হউক না কেন, বিরাট একটি আদর্শের জন্য লড়াইয়ে সামিল হইয়াছে অন্ততঃ এই সান্ত্বনাটুকু হইতে ত বঞ্চিত হইবে না। কারা লাল ঝাণ্ডার আর কারাই বা তেরঙ্গা ঝাণ্ডার পূজারী তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। যুগযুগান্তর ধরিয়া যে অন্যায় অত্যাচার আর বল্গাহীন শোষণের তাণ্ডব দেশ জুড়িয়া চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধেই তাহারা শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে। ইংরাজরা দেশের শত্রু। জমিদারগণ তাহাদের সহিত হাত মিলাইয়াছে। জমিদারগণ তাহাদেরই সৃষ্ট ফসল। অতএব স্বার্থান্বেষী নির্লজ্জ দমনরাজ ইংরাজ ও জমিদারগণ পারস্পারিক সাহচর্য, সহযোগিতা ও স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলিবে আশ্চর্যের কি।

আলেখ্য হাটে গিয়া আরও একটি অবিশ্বাস্য কথা শুনিয়া রীতিমত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। জমিদারের খাজনা বন্ধ করিয়া জনসাধারণ সেই অর্থে স্বেচ্ছাসেবকগণের আহারাদি যোগান দিতেছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রত্যক্ষভাবে হাঙ্গামা—হুজ্জতিতে মাথা না গলাইয়া গোপনে অর্থ যোগান দিয়া প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী আন্দোলনকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিতে অগ্রসর হইতে সার্বিক সহায়তা করিতেছে।

আলেখ্য নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার বাবার ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। মনে তাহার অশান্তির ফল্গুধারা বহিতেছে। পিতার নিকট মনের ভাব গোপন রাখিবার চেষ্টা করিল। মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল। রে-সাহেব আরাম কেদারায় শরীর এলাইয়া দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন। দরজায় পায়ের শব্দ পাইয়া চক্ষু খুলিয়া আলেখ্যকে দেখিতে পাইলেন। ম্লান হাসিয়া বলিলেন—কি আলো, কিছু বলবে আমায়?

আলো বাবার প্রশ্নটি সতর্কতার সহিত এড়াইয়া যাইয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—তোমার শরীর কেমন আছে বাবা ?

খারাপ ত কিছু বুঝছিনে। আর একটু আধটু যা অসুবিধে আছে তা নিছকই বুড়ো-হাড়ের দোষ। মা আলো, কমলকিরণ কোথায় রে, দুপুরের পর থেকে দেখছিনে, গেছে কোথাও ?

হাঁ বাবা, ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কোথায় যেন গেছে। দুপুরে আমি একটু শুয়েছিলুম। দুর্গার মা'কে বলে গেছে, আমি উঠলে বলতে।

রে-সাহেব অস্ফুট স্বরে বলিলেন—হু !

আলেখ্য বলিল—বাবা, তোমার জমিদারি তুমিই বুঝে নাও, আমার দ্বারা কিছু হবার নয়।

রে-সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন—কেন মা, জমিদারির ওপর হঠাৎ এমন বীতশ্রদ্ধার কারণ কি, হয়েছে কিছু ?

না বাবা, কিছুই হয়নি। কিছু হলে না হয় মোকাবেলা করা যেত, নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য কিছু করতে পেরেছি, এটুকু সান্ত্বনা অন্ততঃ থাকত। অসহায়ভাবে নিজের আঙুল কামড়াতে হচ্ছে বলেই ত যন্ত্রণায় দগ্ধে মরতে হচ্ছে !

সাহেব মুখের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিলেন—কি ব্যাপার, দেশের হালচাল হঠাৎ করে বুঝে ফেলেছ, মনে হচ্ছে ? জমিদারিটা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবে কিনা, মনে সন্দেহ জাগছে বুঝি ?

কেমন যেন একটা চাপা ক্ষোভ প্রজাদের মধ্যে ক্রিয়া করে চলেছে, বুঝেও মাথামুণ্ড কিছু বুঝিনে বাবা ! প্রজাদের একটি বড় অংশ সরাসরি আন্দোলনে সামিল হচ্ছে না। গোপনে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনে সাহায্য করে চলেছে ! সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হচ্ছে, কে যে আন্দোলনের সাথে আর কে যে বিপক্ষে তা-ও বুঝার উপায় নেই। কার্যতঃ আমাদের সবচেয়ে বড় অবলম্বন অমরপুরের হাটটাকে স্বদেশীরা গ্রাস করে ফেলেছে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সাহেব বলিলেন—বুঝলুম মা। তুমি কি জোর করে হাট চালু রাখার চিন্তা করছো ?

এখন পর্যন্ত পাকাপাকি সিদ্ধান্ত কিছু নেই নি।

কমলকিরণ কি বলে ?

ও-ত বারবারই বলে এখনই নার্ভাস হবার কি আছে ?

মনকে শক্ত করতে হবে। বিপদে ভেঙে পড়া কাপুরুষের কাজ। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত দরকার হলে লাঠি—

ভুল ! ভুল মা ! বুদ্ধি, স্নেহ আর মমতা দিয়ে যদি প্রজাদের মন জয় করতে না পার, লাঠি দিয়ে কি তাকে সম্ভব করতে পারবে ? বল পূর্বক হাত বাঁধা যায়, পা

বাঁধা যায়। কিন্তু মনকে বাঁধবে কি দিয়ে মা? মন যে স্বাধীন রয়েই যাবে।

তুমি ঠিকই বলেছিলে বাবা, অমরনাথবাবু একটা জ্বলন্ত আগুনের টুকরো। শুনে আমি তখন মনে মনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, যৌবনের উন্মাদনায় টগবগে রক্তের তেজ নিয়ে নূতন কিছু করার নেশায় মেতেছেন তিনি। দুদিনেই তাঁর উৎসাহে ভাঁটা পড়বে।

কিন্তু—

কিন্তু এখন দেখছি সে আগুনের টুকরো থেকে ফুলকি বেরিয়ে ক্রমেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সে- আগুনের তাঁত আজ তোমাকেই সব চেয়ে বেশী দগ্ধে মারছে, তাই না? এইবার ম্লান হাসিয়া বলিলেন— মা আলো, অমরনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই ত তোমায় সতর্ক করে দিয়েছিলুম, অমরনাথের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হয়ে বরং সখ্যতা স্থাপনের চেষ্টা করবে। এতে তোমার জমিদারি রক্ষা পেত কিনা জানি না, তবে চিত্তশুদ্ধি অন্ততঃ ত্বরান্বিত হ'ত।

আলেখ্য কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। পিতার কথার শেষাংশটুকু ভাল শুনিতে পায় নাই। অকস্মাৎ যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিল— কি বললে বাবা?

সাহেব তাড়াতাড়ি কথাটিকে চাপা দিতে যাইয়া বলিলেন—বলছিলুম কি প্রজারা কি বলে? প্রজাদের মনের কথা কিছু বুঝতে পারছ?

নিরক্ষর অজ্ঞ প্রজাদের নিজস্ব মতামত আর কি থাকতে পারে। যা স্বাভাবিক তা-ই ঘটছে। জোয়ারের জলের মত যেদিকে ঢালু পাচ্ছে সেদিকেই বইছে। স্বদেশী আর বলশেভিকগণ প্রতিনিয়ত একই বিষ তাদের কানে ঢেলে চলেছে, প্রজাহিতবিমুখ স্বার্থগৃধ্র জমিদারের পতন ঘটলেই নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। দেশে অভাব অনটন আর থাকবে না। অর্দ্ধাহার আর অনাহারের দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। অন্ন-বস্ত্রের অভাবও ঘুচে যাবে।

অমরনাথের দলের লোকেরা এসব বলে বেড়াচ্ছে বুঝি? আলেখ্য অত্যুগ্র আগ্রহের সহিত জবাব দিল—তবে আর বলছি কি বাবা! স্বদেশী গুণ্ডারা অসহায় নিরীহ নম্র লোকগুলোর মাথায় জমিদার-বিদ্বেষী পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছে! আর সেই আনন্দে রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সবাই।

এটা কি তোমার দুর্বল মনের ধারণা, নাকি কিছু বাস্তবের ছোঁয়া রয়েছে?

সম্পূর্ণ বাস্তব ঘটনা বলেই মনে করতে পার। আর অমরনাথবাবুই—

প্রজারা কি তবে দেশের মাটিতে সজ্জন বলতে একমাত্র অমরনাথকেই মনে করে?

আমার চেয়ে ভাল তুমিই ত এর উত্তর দিতে পারবে বাবা। তোমার চোখে ত ওই স্বদেশী পাণ্ডাটা আদর্শস্বরূপ ছিল এক সময়।

ম্লান হাসিয়া সাহেব বলিলেন—বড্ড দেরী হয়ে গেছে! বড্ড দেরী করে আমাদের চৈতন্য হ'ল মা! নাভিশ্বাস উঠে গেছে, একে বাঁচিয়ে রাখবে কেমন করে?

আলেখ্য নীরবে বাবার দিকে চাহিয়া রহিল।

সাহেব বলিয়া চলিলেন—সবই যুগ বিবর্তনের ফল মা, যুগ বিবর্তনের ফল! প্রজারা আর আমাদের সম্মান করবে কেন, যুক্তি দেখাতে পার? তাদের দুঃখ-দুর্দশায় আমরা কতটুকু চোখের জল ফেলেছি যে, সম্মান দেখাতে যাবে? দেশের লোককে আমরা স্বার্থান্বেষীর দল আফিঙ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলুম। আজ তাদের ঘুম ভেঙেছে। ঘুম কাটিয়ে চোখ মেলে তাকিয়েছে। আজ রাজার অস্ত্রের ধার কমে গেছে, গণশক্তির জোয়ার আসছে, বুঝছ না মা আলো? আমরা, ধনীরা এতদিন দেশের দরিদ্র, আর্ত, পীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষগুলোকে এতদিন সত্যই আফিঙ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলুম। বুদ্ধিমান ও বিত্তশালীদের আফিঙের গুলির তেজ আজ কমে গেছে। খিদের জ্বালায় তাদের ঘুম ভেঙে গেছে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা মা। পেটে জ্বালা থাকলে পুরনো আইন কানুন, নীতির কথা ও চোখরাঙানিতে তারা থামবে, বিশ্বাস হয় না। তাদের সে ঘুম আজ কেটে গেছে। এক সঙ্গে জেগে ওঠার জন্য উন্মুখ। তাদের এ-জাগরণকে তুমি ঠেকাবে কি দিয়ে মা আলো? তারা যে জোয়ারের জলের মত সবেগে সমুদ্যত। কোন বাঁধনে তাদের এ-গতি রোধ করবে, বলতে পার?

এমন সময় বিষণ্ণমুখে কমলকিরণ সে ঘরে প্রবেশ করল। তার চোখে-মুখে হতাশার ছাপ।

আলেখ্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিল—কি ব্যাপার! আপনাকে এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে—কিছু হয়েছে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কমলকিরণ বলিল—যা হবার নয় তাই আজ ঘটে গেছে। কথা বলিতে বলিতে সে পকেট হইতে একটি ভাঁজ করা কাগজ বাহির করিয়া আলেখ্যর দিকে বাড়াইয়া দিল।

আলেখ্য ব্যস্ত হাতে তাহার নিকট হইতে কাগজটি লইয়া ভাঁজ খুলিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। ইন্দুর চিঠি। রে-সাহেবকে সম্বোধন করিয়া লেখা। সে চিঠিটি তাহার বাবার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—বাবা, ইন্দু এ-চিঠিটি তোমাকে লিখেছে।

সাহেব বলিলেন—তুমিই পড় আলো। আমার চশমাটা আলমারিতে রয়ে গেছে। তুমিই পড় মা।

আলেখ্য পড়িতে লাগিল—

পরম পূজনীয় কাকাবাবু,

আমি আমার ভাগ্যের খোঁজে চললুম। অমরনাথবাবুর সুমহান আদর্শ ও স্বদেশী কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়েই আমাকে এ-পথ বেছে নিতে হয়েছে। যে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দেশ ও দশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন তাতে আমার-ও যে কিছু করণীয় আছে জ্ঞান করেই তাঁকে অনুসরণ করার ব্রত গ্রহণ করেছি।

আশীর্বাদ করুন, জীবনে চলার পথে যদি কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হই তবে সে-বাধাকে যেন ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সাহসিকতা দিয়ে অতিক্রম করতে পারি। দেশ ও দশের কাজে নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে তিলোত্তমা হবার যে-ব্রত আমি গ্রহণ করেছি তাতে যদি ব্যর্থ হই তবে তাকে আমার অযোগ্যতার কারণ বলেই মনে করব। আর যদি সাফল্য আসে তবে তাকে আপনার প্রেরণা ও আশীর্বাদের কপাল মনে করে শ্রদ্ধায় নতুন করে মাথা নত করব। প্রথম দর্শনের সে শুভমুহূর্তে আপনার মুখ থেকে অমরনাথবাবুর সততা, নিষ্ঠা, ন্যায় পরায়ণতা, নীতি ও আদর্শের কথা শুনেই তাঁর চরণে আত্মোৎসর্গ করেছিলুম। আজ তাঁর সুখ-দুঃখ আর সাফল্য ব্যর্থতার সমভাগী হবার যে-ব্রত আমি গ্রহণ করেছি, আশীর্বাদ করুন কোন পরিস্থিতিতেই তাঁকে অনুসরণ করার সুমহান ব্রত থেকে যেন কোনদিন আমাকে সরে আসতে না হয়। বাবা—মা-কে আমার হয়ে বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পণ করলুম। আশা করি আপনার স্নেহ, ভালবাসা ও মমতা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

বীনতা

আপনার স্নেহধন্যা ইন্দু

চিঠিটি পড়া শেষ করিয়া আলেখ্য অন্যমনস্কভাবে আবার সেটিকে ভাঁজ করিতে করিতে বলিল—বাবা, ইন্দু কি তবে তোমার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েই—

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রে-সাহেব বলিলেন—আমার পরামর্শে ইন্দু এ-কাজ করেছে মনে করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করতুম আলেখ্য। তবে তার এ-মহৎ কাজের পিছনে আমার যে কিছুমাত্র অবদান নেই যদি বলি, সত্য গোপন করার দায়ে পড়তে হবে মা আলো।

রে-সাহেব স্বীকার করিলেন, সেইদিন বৈকালে অসুস্থ বাল্যবন্ধু বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্যকে দেখিতে যাইবার সময় ইন্দু তাঁহার পিছন নিয়েছিল। তিনিই তাকে অমরনাথের চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়েছিলেন। কেবলমাত্র অশান্তি এড়াইবার জন্যই তিনি আলেখ্য ও কমলকিরণের নিকট এই ব্যাপারটি গোপন রাখিয়াছিলেন। ইন্দু ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট অমরনাথের প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিল, অমরনাথের মধ্যে সে নাকি মহাত্মাজীর ছায়া লক্ষ্য করিয়াছে। রে-সাহেব যে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে অমরনাথের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, অমরনাথ লোকটি এমন নিঃস্বার্থপরায়ণ ও পরোপকারী ও কর্মনিষ্ঠা যে, একদিন দেশের মানুষ তাহাকে হাসিমুখে মাথায় তুলিয়া নাচিবে। আলেখ্য আত্মস্বার্থের মোহে তাহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর ধারণা অন্তরে পোষণ করিয়া আসিয়াছে। বহুবার বলিয়াছে লোকটি গান্ধীজীর ভেকধারী এক সাক্ষাৎ শয়তান। নন্-কোঅপারেশনের যে দল গজাইয়াছে ছলে-বলে-কৌশলে তাহার পাণ্ডা হইয়া বসিয়া দেশের নিরীহ-অজ্ঞ মানুষগুলিকে ধাপ্পা দিয়া সমাজের বুকে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছে। দেশ সেবার নামে তাহাদের জমিদারিটি গ্রাস

করাই তাহার গোপন অভিসন্ধি। ইন্দু কিন্তু অমরনাথের বাড়ি হইতে ফিরিয়া একদিন কথাপ্রসঙ্গে রে-সাহেবকে বলিয়াছিল যে, সে রে-সাহেবের কথার সত্যতা অমরনাথের মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছে। যে সভ্যতা মিথ্যা জৌলুসের প্রলেপ দিয়ে মোড়া, যে-সভ্যতায় অনাহারাক্লিষ্টের মুখের গ্রাস, শোক-তাপদগ্ধ মানুষের জীবন ধনীর মুঠোর মধ্যে এমন ভয়ানক নিরুপায় করে এনে দেয়, তাকে ধ্বংস করার ব্রত নিয়েই অমরনাথবাবু দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছেন। যদি তাই হয় দেশের মানুষ মৃতপ্রায় সে সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে যাবে কিসের মোহে। মানুষের কাল-ঘুম আজ ভেঙ্গেছে। বস্তাপচা সে-সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য তারা সুমহান যজ্ঞের আয়োজন করেছে, অমরনাথবাবু তার পৌরহিত্য করার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন। তাঁর জয় অনিবার্য।

রে সাহেব বলিলেন—মা আলো, অমরনাথ মানুষ চিনতে জানে। বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে ইন্দুর মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছিল সে। স্পষ্টই বুঝেছিল, সে সহজেই দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারবে। হাসিমুখে আত্মোসর্গ করতে পারবে, অভিজ্ঞতা দিয়ে এ-সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারবে বুঝেই না ইন্দুকে কাছে ডেকে নিয়েছে। তাকে নিজের সুখ-দুঃখের অংশীদার করতে উৎসাহিত হয়েছে। দেশের ডাক শুনে যারা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে জানে, স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করতে পারবে তারাই ত সত্যিকারের সত্যাগ্রহী, সত্যাশ্রয়ী। সে যদি সেই মনোভাব নিয়ে অমরনাথের হাতে হাত মিলিয়ে থাকে, অমরনাথও যদি তাকে সাদরে বরণ করে থাকে তবে ত এর মধ্যে কোন অপরাধ আমি দেখি নে মা আলো।

আলেখ্য চোখ দুটি কপালে তুলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল—সে কী বাবা! এর মধ্যে অমরনাথবাবুর কোন অন্যায়ই দেখতে পাচ্ছ না! একটা মেয়েকে তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে তিনি ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলেন কোন অধিকার বলে?

যে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েই রয়েছে, তাকে তুমি আটকে রাখবে কি করে আলো?

এসব তোমার নীতির কথা বাবা। এসব নাটক-নভেলে চলে। বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলেই অশান্তি—

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া রে-সাহেব বলিলেন—হাঁ মা। অশান্তি তুমি করতে পার ঠিকই। কিন্তু জেনে রেখো, তাতে মনের তিক্ততাই বাড়বে, অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরতে হবে। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

কমলাকিরণ এতক্ষণ কপালে হাত দিয়া নীরবে বসিয়াছিল। দুর্বিসহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল—তাই বলে এতবড় একটা অন্যায়কে নীরবে হজম করতে বলছেন কাকাবাবু! আমি কিন্তু শয়তানটাকে ছেড়ে কথা বলব না, উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব!

ম্লান হাসিয়া রে-সাহেব বলিলেন—সে চেষ্টা তুমি করতে পার কমলাকিরণ।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তোমার সব চেষ্টাই বিফলে যাবে। শুধু কাঁদা মাখামাখিই হবে। পরিণামে কলঙ্কের দাগটুকু ছাড়া আর কিছুই পাবে না, বুড়ো মানুষটার কথাটা মনে রেখো।

কমলাকিরণ তেমনি গর্জন করিয়া উঠিল—পরিণামে যা হয় হবে। স্কাউণ্ড্রেলটাকে এত সহজে ছেড়ে দিলে নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হবে। শাস্তি ওকে পেতেই হবে।

তা-ত হতেই পারে কমলাকিরণ। তবে একটা কথা ভুলে যেয়ো না, ইন্দু আজ আর নাবালিকা নয়। সে সাবালিকা। নিজের ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা তার হয়েছে। আইনও এই কথা স্বীকার করবে।

আলেখ্য ফোঁস করিয়া উঠিল—বাবা, কমলাকিরণবাবু ত তোমার ভরসাতেই বোন ইন্দুকে নিয়ে এখানে এসেছেন। মিঃ ঘোষও বিশ্বাস ও নির্দ্বিধায় তাদের আমাদের আশ্রয়ে পাঠিয়েছিলেন। আজ তোমার মুখে এধরণের কথা শোভা পায় না বাবা। আলেখ্য বলিতে চাহিল—তোমার দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করছে বাবা! কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—মিঃ ঘোষকে তুমি কি বলে প্রবোধ দেবে বাবা? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি তোমাকে ছেড়ে কথা বলবেন না।

কি জানি, হলে হতেও পারে। কিন্তু মিঃ ঘোষের প্রতি আমার বিশ্বাস অন্যরকম মা। আশা করি তিনি এমন অবুঝ হবেন না যে, অমরনাথের মত সোনার টুকরো ছেলেকে অস্বীকার করবেন। তার মত একটি রত্নকে জামাই করে ঘরে আনতে পারলে আমি অন্ততঃ নিজেকে ধন্য মনে করতুম।

বাবার কথায় আলেখ্যর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। রাগে ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। ইহার কতখানি কৃত্রিম, আর কতখানি যে আন্তরিক রে-সাহেব তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তবে অমরনাথকে তিনি জামাই করিলে আলেখ্য যে তেমন অখুশী হইত তাহা জোর দিয়া বলিতে যেন মনের দিক থেকে উৎসাহ পাচ্ছেন না।

মিঃ ঘোষকে আমি চিঠি দিচ্ছি। সব কথা খোলাখুলি লিখেই চিঠি দেব। তারপর তিরস্কার বা পুরস্কার যা প্রাপ্য মাথা পেতে নেব কমলাকিরণ। আমার এটুকু অন্ততঃ—

তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কমলাকিরণ বলিল—কাকাবাবু, আমার বাবা-মা সহজে এতবড় একটা অন্যায়কে বরদাস্ত করবেন না। আমি একা আসব, প্রথমে এরকমই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলুম। ওটাই বরং ভাল হ'ত। ভুল—বড্ড ভুল করে ফেলেছি! নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারলুম!

আমার একটা কথার জবাব দেবে অমরনাথ? অসহযোগ আন্দোলন কি কেবল-মাত্র আমার জমিদারির এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কেউ যদি চিৎকার করেও এ কথা বলে তবু আমি অন্ততঃ স্বীকার করব না। তাই যদি হ'ত তবে পাটনায় মিঃ ঘোষের মোটরের উইণ্ড স্ক্রীনটা ঢিল মেরে ভেঙে দিয়েছিল কে? তবে এমনও ত হতে পারত,

ইন্দু এখানে না এলে নন্‌-কোঅপারেশনের পাটনা-শাখায়ই যোগ দিত। তবে আর মিঃ ঘোষ মিছিমিছি আমার দোষ দিতে যাবেন কেন? তোমাদের কি বিশ্বাস, এ বুদ্ধিটুকু সম্বল করে তিনি আজীবন কোর্টে ওকালতি করেছেন।

কমলকিরণ কোন যুক্তিই মানতে চাচ্ছে না। এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে অমরনাথের টুঁটি টিপে ধরে মনের ঝাল মিটিয়ে নিতে চাইছে। ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে যাবার জন্য উন্মুখ। আলেখ্য কোনরকমে তাকে বাধা দিল। আর বলিল—তবে এ ছুঁতোটুকু সম্বল করেই তারা বড় রকম একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসবে। মুখপুড়ি নিজের কপাল নিয়ে গেছে, মরুক গে! তার পেটে এত কুবুদ্ধি ছিল, জানতুম না! সে বংশের মুখে চুণ-কালি মাখিয়ে অমরনাথের মত একটা ধাপ্পাবাজের হাতে নিজেকে হাসিমুখে সঁপে দিতে পারে তাকে দিয়ে সংসারের বড় রকমের কোন উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হ'ত না। সে স্বেচ্ছায় তার আত্মজনদের ছেড়ে নিজের সুখ-সাচ্ছন্দকেই বড় করে দেখেছে, তার জন্য দুঃখ করা বৃথা!

রে-সাহেব বলিলেন—তোমরা এ নিয়ে ভেবো না। মিঃ ঘোষের সঙ্গে বোঝাপড়া যা করতে হয়, আমিই করব।

কমলকিরণ নীরব দৃষ্টিতে রে-সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঊনিশ

রে-সাহেব একটি প্রবাসী পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাইতেছেন। আলেখ্য প্রাতঃস্নান সারিয়া তাহার বাবার ঘরে আসিল। পত্রিকার পাতায় চোখ রাখিয়াই রে-সাহেব বলিলেন—আজ যেন একটু সকাল সকালই স্নান সারলে মা আলো? কি ব্যাপার, কোথাও যাওয়ার কথা আছে নাকি?

আলেখ্য বলিল—একবার সেটেলমেন্ট অফিসে যাব ভাবছি বাবা। পত্রিকার পাতায় দেখলুম, ইংরেজ সরকার সেটেলমেন্ট মারফৎ এক নতুন কায়দায় জমিদারী পত্তন করছেন। প্রজাদের মধ্যে খাজনার চুক্তিতে জমি বণ্টনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নেব ভাবছি।

রে-সাহেব পত্রিকা হইতে মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুমিও কি সেরকম কোন চিন্তা করেছ নাকি আলো?

আলেখ্য তাচ্ছিল্যের সহিত তাহার বাবার প্রশ্নের উত্তর দিল—না, পাকাপাকি কিছু ভাবিনি এখনও। যাই না, কথা বলে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিতে দোষ কি বাবা?

না, দোষের আর কি আছে। তবে এ-শুভবুদ্ধিটা আরও কিছুদিন আগে হলে সম্মান ও প্রতিপত্তি দু-ই রক্ষিত হতে পারত, এটুকুই যা।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আলেখ্য বলিল—আজ আমার নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি বাবা দেশটা কোনদিকে যাচ্ছে। স্বদেশী আন্দোলনটা আসলে কি জিনিস সে ধারণা হতে হতেই ত ক'টা মাস কেটে গেল।

রে-সাহেব নীরবে ম্লান হাসিলেন।

আলেখ্য এইবার বলিল—বাবা, দেশ যে পথে এগিয়ে চলেছে, তেমন বুঝলেন জমিদারিটাই তাদের নামেই লিখে দেব। আমি ভালই জানি, তুমিও এটাই চাও।

মা আলো, আমিও জানি এটা তোমার মনের কথা নয়, অভিমানেরই—

অভিমানের কি আছে বাবা। তুমিই ত বহুবারই বলেছ, এর চেয়ে শান্তি অন্য কোন কিছুতেই নেই। দেশের জন্য, দলের জন্য সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব রিক্ত হওয়ার মত আনন্দ অন্য কোন কিছুর মধ্যেই নেই। একদিন তোমার কাছ থেকে পরোক্ষভাবে উৎসাহ পেয়েও সব কিছু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম, আজ মনে হচ্ছে, সে-পথই যথার্থ পথ বাবা। স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণী, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে উল্লিখিত মহান আদর্শ, চারণ কবি মুকুন্দদাশের আত্মনিবেদনের উদাও আহ্বান আর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শকেই এ মুহূর্তে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেছি বাবা।

রে-সাহেব অপলক চোখে আলেখ্যর মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন,—তিনি এতদিনেও নিজের মেয়েকে চিনিতে পারেন নাই। যাকে এতদিন বজ্রের চেয়েও কঠিন কঠোর মনে করিতেন, আজ বুঝিলেন আসলে তাহার ভিতরটা কুসুমের চেয়েও কোমল। ঝোঁকের মাথায় জমিদারির দায়িত্ব কাঁধে লইয়া, জমিদারিটা নূতন করিয়া সাজাইতে যাইয়া রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। তাহার কল্পনা আর বাস্তবের মাঝে যে এতখানি ফাঁক রহিয়া গিয়াছে আজ সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছে।

ম্যানেজার ব্রজবাবু আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। আলেখ্য তাহাকে তাহাদের জমিদারির এক্তিয়ারভুক্ত যাবতীয় সম্পত্তির একটি তালিকা তৈয়ারী করিতে বলিয়াছিল। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। আলেখ্য তাঁহার হাত হইতে তালিকাটি লইয়া তাহাতে চোখ বুলাইতে লাগিল।

রে-সাহেব আপন মনে বলিতে লাগিলেন—দেশে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন সে হাওয়ার বিপরীত দিকে নৌকো বেয়ে নিয়ে যাব, পরিশ্রমই সার হবে, কাজের কাজ কিছু হবে না।

ব্রজবাবু বলিলেন—আপনারা ত দীর্ঘদিন দেশ ছাড়া, এখানকার অবস্থা কিছুই জানা নেই। আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি, এ অঞ্চলে তেরঙ্গাই বলেন, আর লাল ঝাণ্ডাই বলেন, কোনদিনই এসবের উৎপাত ছিল না। গ্রামের মানুষ গায়ে গতরে খেটে সুখে শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছিল। বাইরের জগতে কোথায়, কি পরিবর্তন ঘটছে সে-সবের ধার ধারত না। আমাদেরও শান্তি ছিল। কোত্থেকে যে বিষ-ফোঁড়ার মত অবাঞ্ছিত ঝামেলা এসে হাজির হ'ল, মানুষের শান্তি-সুখ কর্পূরের মত উবে গেল। স্বদেশীরা বলছে, দেশের সর্বত্র জাগরণের জোয়ার বইছে। আমরা ত আর তার থেকে দূরে সরে থাকতে পারি না। আবার লাল ঝাণ্ডাধারী বলশেভিকরাও বলছে,

পৃথিবীর মানুষ এতদিন মোহান্ধ হয়ে নিশ্চিন্তে গা-ভাসিয়ে চলছিল। আজ মোহ-মুগ্ধ মানুষের সম্বিৎ ফিরে এসেছে। আমরা ত আর উট পাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজে থাকতে পারি না, অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হতেই হবে। সর্বত্র যে-জাগরণের উৎসব শুরু হয়েছে, আমাদেরও তাতে অংশ নিতে হবে। জাগরণ! সবাই চায় দেশে জাগরণের বন্যা বয়ে যাক। পূর্ব আকাশের লাল সূর্যের দিকে ছুটে যাক দলে দলে কাতারে কাতারে শোষিত লাঞ্ছিত নির্যাতীতের দল।

রে-সাহেব বলিলেন—দেশের মানুষ হতাশা আর হাহাকারের মধ্যে দিনের পর দিন বছরের পর বছর কাটিয়ে সত্যই হাঁপিয়ে পড়েছিল। আজ তারা মনে-প্রাণে এমন এক পরিবর্তনের প্রত্যাশায় পথ চেয়ে উন্মুখ হয়ে বসে যা তাদের ক্ষুধার অন্ন, আর উন্মুক্ত বাতাস যোগাবে।

আলেখ্য তাহার পিতার আচরণে নূতন করিয়া বীতশ্রদ্ধ হইল। তাঁহার কথায় সে অন্ততঃ এইটুকু সিদ্ধান্ত লইতে পারিয়াছে, তাহার পিতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে যার ফলে ইন্দু এমন জঘন্যতম অপরাধ করিতেও দ্বিধা করে নাই। ইন্দুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আলেখ্য রাগে-দুঃখে-অপমানে গজ গজ করিতে করিতে ব্রজবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—আমাদের সংস্রব যদি ইন্দুর পছন্দ না হয়ে থাকে, তবে সে আমাকে সরাসরি বললেই পারত। আমি না হয় তার পাটনায় যাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিতুম। কিন্তু এতগুলো লোকের মুখে কালি দিয়ে বিপথগামী হওয়ার এমন কি দরকার ছিল?

ব্রজবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন—এ কেমন কথা বললে দিদিমণি। বলে কয়ে কেউ গৃহত্যাগ করতে পারে, নাকি কোনদিন তাকে কেউ সমর্থন করে?

যাক, ইন্দুর প্রসঙ্গে আলোচনা করে আর বৃথা কাল ক্ষয় করার ইচ্ছে নেই ম্যানেজারবাবু। আমাদের কাছে সে আজ মৃত!

কমলকিরণ ইন্দুর আকস্মিক কুকর্মের উল্লেখ করিয়া তাহার পিতাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছিল। আজ তাহার উত্তর আসিয়াছে। মিঃ ঘোষ সস্ত্রীক পাটনা হইতে শীঘ্রই আসিতেছেন। ইতিমধ্যে আলেখ্য কমলকিরণকে লইয়া ইন্দুর খোঁজে গিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার দেখা পায় নাই। সে অমরনাথের ভগ্নীর সহিত দলের কাজে কোথায় যেন গিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে স্বদেশীদের তিন চারটি সভা সারিয়া ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। অমরনাথও বাড়ি ছিল না যে-বেশ করিয়া মনের ঝাল মিটাইয়া আসিতে পারিত। তাই আলেখ্যকে হতাশা হইয়াই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। তবে অমরনাথের বিধবা মা তাদের যথেষ্ট আদর যত্ন করিয়াছিলেন। আলেখ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিয়াছিল, অমরনাথের দলে নাম লিখাইয়া ইন্দু সম্পূর্ণ নূতন এক জগতে পদার্পণ করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের কাজে মন-প্রাণ সঁপিয়া দিয়াছে। উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। দম ফেলাইবার সময় পায় না। আলেখ্য আরও একটি সংবাদ শুনিয়া যাহাতে তাহার

আপাদমস্তক জ্বালা ধরিয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যেই নারায়ণ সাক্ষী করিয়া অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অমরনাথের সহিত ইন্দুর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

অবিশ্বাস্য ঘটনাটি শুনিয়া কমলকিরণ ত রাগিয়া একেবারে অগ্নিশর্মা। অমরনাথকে ইহার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিয়া তবে ছাড়িবে। আদালতে তাহার নামে মেয়ে অপহরণের মামলা দায়ের করিবে। রে-সাহেব অনেক বুঝাইয়া শুনাইয়া তবে তাকে নিরস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। সত্য বলিতে কি; আদালতে অমরনাথের বিরুদ্ধে মামলা টিকিবে না। কারণ ইন্দু সাবালিকা। তাহার নিজের ইচ্ছায় কাজ করিবার অধিকার আছে। কেহ তাহাকে মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া এই কাজ করিয়াছে. এইরকম অভিযোগ আইনের স্বীকৃতি পাইবে না। তাহা ছাড়া অন্য কোন ভাবে অমরনাথকে শাস্তিদান বা অপদস্ত করা কোনটিই সম্ভব হইবে না। অমরনাথ এখন স্বদেশীদের শিরোমণি। তাহার সামনে দাঁড়াইয়া কটু কথা বলিবার কাহারই বা সাধ্য আছে। সব চেয়ে বড় কথা, সে ত কোন অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত হয় নাই যে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। আর ইন্দু'র মতের বিরুদ্ধে তাহাকে জীবন সঙ্গিনী করিতেও প্রবৃত্ত হয় নাই। ইন্দু স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই তাহার কাছে ছুটিয়া গিয়াছে। হাসিমুখে তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া লইয়াছে। অতএব তাহার বিরুদ্ধে নারী অপহরণের মামলা টিকিবে কেন? অনন্যোপায় হইয়াই আলেখ্য ও কমলকিরণ অমরনাথের বাড়ি হইতে বিষন্ন মনে ফিরিয়া আসিল।

কুড়ি

আলেখ্য ও কমলকিরণ হতাশ হইয়া অমরনাথের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিল। ইন্দুর ব্যাপারে তাহারা বড়ই উদ্বিগ্ন। তাহার সহিত কমলকিরণের মুখোমুখি দেখা হইলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হইয়া যাইত। কিন্তু চেষ্টা করিয়াও দেখা পাওয়া গেল না। কবে, কোথায় দেখা পাওয়া যাইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

কমলকিরণের টেলিগ্রাম পাইয়া তাহার পিতা-মাতা পাটনা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

রে-সাহেবের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করিয়া মিঃ ঘোষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। পাটনা হইতে এখানে পৌঁছাইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অমরনাথের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিলেন তিনি। প্রয়োজনে পুলিসের সাহায্য লইয়া অমরনাথের কৃতকর্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতেও ইতস্ততঃ করিবেন না, ভাবিয়া আসিয়া ছিলেন।

আলোচনার শুরুতেই তিনি রে-সাহেবের সহিত রাগে গজ গজ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—আমি ছাড়ব না মিঃ রয়! স্কাউন্ড্রেলটা আমার মুখে চুণ-কালি মাখিয়ে দিয়েছে। আমি ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়ব। যত টাকা লাগে, আমার যথা সর্বস্ব খুইয়েও ওই স্বদেশী পান্ডাটাকে একবার দেখিয়ে দিতে চাই, কার

সর্বনাশ সে করেছে! এটুকু অন্ততঃ বুঝুক, কত ধানে কত চাল।

রে-সাহেব নীরবে মুচকি হাসিলেন।

মিঃ ঘোষ রাগে দুঃখে অপমানে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—আপনি ত জানেন মিঃ রয়, ইন্দু আমার একমাত্র মেয়ে। আর সে-ও আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন বিলেতের মাটিতে কাটিয়ে এসেছে। শিক্ষা-দিক্ষায় আচার-ব্যবহারে তার মধ্যে একটা মার্জিত রুচিবোধ রয়েছে। স্বদেশী গুণ্ডাটা ওকে এমন কোন যাদুমন্ত্র তুকতাক করেছে যার ফলে ইন্দু তার মোহে অন্ধ হয়ে ছুটে গেছে।

মিসেস ঘোষ কহিলেন—মিঃ রয়, ইন্দুর বিয়ের জন্য পাটনায় যাবতীয় ব্যবস্থাদি পাকা করা হয়ে গিয়েছিল। পাত্র ডাক্তার। বিলেতে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাইতে খুবই আগ্রহী। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতির অভাব। আমরা ওকে কথা দিয়েছি, বিয়ের পর বিলেতে যাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার আমরা বহন করব। কিন্তু এরই মধ্যে কী অঘটন হয়ে গেল।

মিঃ ঘোষ কহিলেন—তার বিয়ের জন্য কত উঁচু মহলে যোগাযোগ করেছি! আমাদের স্ট্যাটাস, পজিসন অনুযায়ী ঘর ও বর না হলে সোসাইটিতে মুখ দেখানোই যে দায় হয়ে পড়বে! এখন দেখছি, আমাদের এতদিনের আশা-আকাঙ্খা রাহুতে এক মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলল!

মিসেস ঘোষ কহিলেন—আমি ত এখনও বিশ্বাস করতে পারছিনে, আমার মেয়ে ইন্দু অজ পাড়াগাঁয়ে এসে শেষ পর্যন্ত এঁদোপুকুরে ডুবে—

রে-সাহেব ম্লান হাসিয়া বলিলেন—মিসেস ঘোষ, মানুষের সব আশাই কি পূর্ণ হয়? আর তা-ই যদি হ'ত তবে ত ব্যথতা হতাশা বা হাহাকার বলে কোন কিছুই মানুষের জীবনে থাকত না।

ক্ষুব্ধ মিঃ ঘোষ বলিলেন—মিঃ রয়, আমি ভেবে পাচ্ছিনে, দেশটা কি সত্যই মগের মুল্লুকে পরিণত হয়ে গেল! ন্যায়-অন্যায়, বিচার-বিবেচনা বলে কিছু রইল না। আমি বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যেটুকু বুঝেছি, ব্যাপারটা স্রেফ কিডন্যাপিং কেস। অন্য যে, যা-ই বলুক, দেশের কাজ, স্বদেশী আন্দোলন, সমাজসেবা—সব ধাপ্পা। বিরাট একটা ধাপ্পা মশাই! দেশোদ্ধারের নামে সমাজের বুকে একটা মিথ্যা চমক সৃষ্টি করাই ওদের লক্ষ্য। শিক্ষিতা, মার্জিত রুচি সম্পন্ন আর বুদ্ধিমতী আমার ইন্দু কিনা এত বড় একটা ধাপ্পার ফাঁদে পড়ল। এ যে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না মিঃ রয়।

রে-সাহেব ম্লান হাসিয়া কহিলেন—এ-মুহূর্তে আপনার কোন কথারই প্রতিবাদ করার ইচ্ছা আমার নেই। তবে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটনাটা ঘটে গেল বলে আমিও আন্তরিক দুঃখিত। আমার কথা যদি শোনেন মিঃ ঘোষ, এটুকু অন্ততঃ বলতে পারি, অহেতুক হাঙ্গামা হুজ্জতিতে জড়িয়ে না পরাই হয়ত বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

মিঃ ঘোষ গুলি খাওয়া বাঘের মত গর্জিয়া উঠিলেন—আপনি বলছেন কী মিঃ রয়, এত বড় একটা সর্বনাশকে মুখ বুজে মেনে নিতে বলছেন! তাছাড়া এ রকম একটা ঘটনাকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশ যে অনাচারে ছেয়ে যাবে।

ম্লান হাসিয়া রে-সাহেব বলিলেন—আপনি আমি যাকে অন্যায়-অবিচার বলে অসন্তোষ প্রকাশ করছি, আপনার সাবালিকা মেয়ে ইন্দু কিন্তু তাকে সঙ্গত মনে করে গৃহত্যাগ করেছে। জানবেন, আইনও একই কথা বলবে। আশা করি অস্বীকার করতে পারবেন না। অমরনাথ ত ইন্দুকে কিডন্যাপ্ড করতে দলবল নিয়ে এখানে হাজির হয় নি। কোন প্রলোভন দেখিয়েও ওকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায় নি। ঘটনা যা ঘটেছে খুবই স্বাভাবিক অমরনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, তার চারিত্রিক মাহাত্মে মুগ্ধ হয়ে ইন্দু হাসিমুখে তার কাছে গেছে। অমরনাথকে আত্মনিবেদন করেছে। অমরনাথ ওকে প্রত্যাখ্যান না করে সসম্মান গ্রহণ করেছে। পত্নীর মর্যাদা দিয়ে জীবন সঙ্গীনী করেছে। আর ইন্দুর কথাই যদি বলেন, আমি বলব, সে এমন কোন অন্যায় করে নি যার জন্য ওকে দোষারোপ করা যেতে পারে। আপনি আমি যে স্টেটাসের কথা ভাবছি, যে পজিসনের জন্য আক্ষেপ করছি, ইন্দু এগুলোকে সে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার না-ও করতে পারে। আর আমার মনে হয় এটাই স্বাভাবিক। কারণ, সব ভাল, সবার কাছে সমান ভাল মনে না-ও হতে পারে। একের কাছে যা কিছু ভাল অপরের কাছে তা সে আদরণীয় হবেই কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই। তা-ই যদি হ'ত তবে জগতে মন্দের অস্তিত্ব থাকত কি? অমরনাথের যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, নৈতিক চরিত্রবল, কর্মনিষ্ঠা ও সততা আমরা ব্যাক-ডেটেড ও গেঁয়ো বলে উড়িয়ে দিতে চাইছি, ইন্দু হয়ত তারই মধ্যে মহত্ব ও ঔদার্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে। আর এরই ফলে অমরনাথ ইন্দুর চোখে আদর্শ পুরুষ বলে বিবেচিত হয়েছে।

মিঃ ঘোষ পূর্ব স্বর অনুসরণ করিয়াই বলিলেন—এমন ও ত হতে পারে বয়সের স্বভাব অনুযায়ী ইন্দু গিল্টিকরা অমরনাথকে দেখে মিথ্যার ফাঁদে পা দিয়েছে। পিতা হিসেবে আমার কর্তব্য ওর ভুল ধরিয়ে দেয়া, শোধরাবার সুযোগ দেয়া। নইলে আমাকে যে কত ব্যচ্যুত হওয়ার দায়ভাগী হতে হবে, মিঃ রয়।

রে-সাহেব বলিলেন—আমি আবারও আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মিঃ ঘোষ, ইন্দু ও অমরনাথ উভয়েই সাবালক। আর কেউ-ই অশিক্ষিত নির্বোধ নয়। অতএব নিজেদের ভাল-মন্দ বোঝার মত বিচার-বিবেচনাবোধ উভয়েরই আছে, আমরা ধরে নিতে পারি। আপনার বক্তব্য অনুযায়ী ওরা যদি নিজেদের পায়ে কুড়োল মারে তা আপনি-আমি ঠেকাব কি দিয়ে, কিসের আশায়, কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য?

ফণাধারী তার ফণা অনেকাংশে ইতিমধ্যেই গুটাইয়া লইয়াছে। মিঃ ঘোষ অসহায় দৃষ্টি মেলিয়া রে-সাহেবের দিকে চাহিলেন। কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নিম্নগামী করিয়া বলিলেন—আপনার কথা অযৌক্তিক অবশ্যই বলব না মিঃ রয়। কিন্তু আমার পরিস্থিতির কথা একবারটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখুন, কী মর্মান্তিক

পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমি। পাটনায় ইন্দুর বিয়ের ব্যবস্থা একরকম পাকা। পাত্র-পক্ষ বিয়ের দিনক্ষণ নির্ধারণের পীড়াপীড়ি করছেন। আগামী শীতের শুরুতেই শুভ কাজ সম্পন্ন করে ফেলব, কথাও হয়ে গেছে। তার এরই মধ্যে ঘটে গেল এমন একটা বিশ্রি ঘটনা! এখন ত পাটনায় আমার পক্ষে মুখ দেখানোই দায়! আর ভদ্রলোককেই বা কি বলবো, কিছুই মাথায় আসছে না!

মিঃ ঘোষ, এ কথা যদি বলেন, আমি বলব, আসলে ভুল করেছেন আপনি, ইন্দু নয়।

মিঃ ঘোষ চোখ দুইটি কপালে তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—তার মানে?

মানে খুবই পরিষ্কার। আপনার মেয়ে এখন সাবালিকা। বিয়ের অর্থই হচ্ছে, সারা জীবনের স্ত্রী-পুরুষের পাকাপাকি একটি ব্যবস্থা। এর জন্য অভিভাবকের চেয়েও তাদের, ছেলে মেয়ের বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব অনেকাংশে বেশী। আপনি ইন্দুর মতামতের অপেক্ষা না করেই—

মিঃ ঘোষ মুখের কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিলেন—মিঃ রয়, ইন্দু আমার মেয়ে। ওকে আমার চেয়ে ভাল কে জানবে বলুন? আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম, সে তার মা-বাবার মতের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলতে পারবে না। সে আমার মেয়ে হয়ে অমরনাথের মত একটা উল্কাপিণ্ডকে কি করে যে পূর্ণচন্দ্র ভাবল, এতবড় একটা ভুল করে বসল, ভেবে পাচ্ছিনে!

রে-সাহেব বলিলেন—মিঃ ঘোষ, আমি যে কথা বলতে চাইছি, ইন্দুর বিয়ের ব্যাপারে কাউকে পাকা কথা দেবার আগে একবারটি ভেবে দেখা দরকার ছিল। এ-ব্যাপারে ইন্দুর মতামতেরও দাম আছে, ভাবা উচিত ছিল।

মিঃ ঘোষ এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন হঠাৎ করিয়া গুছাইয়া উঠিতে পারিলেন না।

রে-সাহেব বলিয়া চলিলেন—ব্যাপারটি এখন যে পর্যায়ে পৌঁছে গেছে সেখান থেকে ওকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করে লাভই বা কি? ইন্দুর ঘরের মেয়ে নারায়ণ সাক্ষী করে যার বিয়ে হয়ে গেছে, ফিরিয়ে এনে তার কি উপকার সাধন করতে পারবেন ব'লে মনে করেন?

মিঃ ঘোষ চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সবই সম্ভব হ'ত মিঃ রায়। কিন্তু সমস্যাও আছে বহু।

যেমন?

যেমন ধরুন ইন্দু যদি এখনও নিজের ভুল বুঝতে পারত, যদি নিজের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের কথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করত তবে ব্যাপারটি আমার পক্ষে তেমন কোন সমস্যাই নয়। অনায়াসেই ছাই চাপা দিয়ে দিতে পারতুম।

কি উপায়ে, জানতে পারি কি মিঃ ঘোষ?

খুবই সাধারণ সে-উপায়। ইন্দু যদি রাজী হ'ত তবেই বাজি মাৎ করে দিতে পারতুম। বাংলার অখ্যাত-অবজ্ঞাত এ গ্রাম থেকে পাটনা শহর বহু দূরের পথ।

এখানে এসে আমার মেয়ে দু'দিনের জন্য কি ছেলে মানুষি করে গেল, সেখানে কে এর খবর রাখে।

রে-সাহেব চোখের তারা দুইটি কপালে তুলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করলেন—সে কী কথা মিঃ ঘোষ! আপনি বলছেন কি, ভাবতেও—বলছি, ইন্দুর সিঁদুর মুছে, শাঁখা ভেঙে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে পাটনায় পাড়ি দিতে পারলেই ল্যাঠা চুকে যেত। ব্যস আমাদের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে ইন্দুর বিয়ের আর কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকবে না।

রে-সাহেব জিভ কাটিয়া রীতিমত হায় হায় করিয়া উঠিলেন—ছিঃ ছিঃ! একী কথা বলছেন মিঃ ঘোষ! পাপ-পুণ্যের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। আপনার ভুলের মাশুল কিন্তু শুধুমাত্র ইন্দুকে দিতে হবে তা নয়, আপনাকেও আমৃত্যু দগ্ধে মরতে হবে। চালাকির দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশান্তিই কিনতে হয়, ভুলে যাবেন না মিঃ ঘোষ।

মিঃ ঘোষ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—মিঃ রয়, তবে আমি কি করব, আপনিই বলে দিন। আমার মাথায় কোন বুদ্ধি আসছে না। আর এক মুহূর্তও ভাবতে পারছি না—মাথা ঝিম ঝিম করছে!

আমি ত অনেক আগেই আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিলুম, আপনি বুঝতে চাইছেন না। আমার কথা শুনুন, ভবিতব্য নাই বা ভাবলেন। যা স্বাভাবিক তাকে স্বীকার করে নেবার চেষ্টা করুন, মানসিক স্বস্তি পাবেন। আর মেয়েটাও সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করতে পারবে।

মিঃ ঘোষ অপলক চোখে রে সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রে সাহেব বলিয়া চলিলেন—মিঃ ঘোষ, স্টেটাস্, পজিসন্ বা সোসাইটি প্রভৃতি শব্দগুলোকে যদি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন তবে আর অমরনাথকে ইন্দুর অযোগ্য পাত্র বলে মনে হবে না। সে নিরক্ষর নয়, এম. এ. পাশ করেছে। সুদর্শন যুবক। রাজপুত্রের মত চেহারা। অমায়িক ব্যবহার, শিষ্টাচারেও তার জুড়ি পাওয়া ভার। তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে যা তাকে সামাজিক খ্যাতি এনে দেবে। তার মত একজন কর্মনিষ্ঠ, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ পাত্রকে আপনি কোনদিক থেকে ইন্দুর অযোগ্য বলতে চাইছেন, বুঝছি না!

মিঃ ঘোষ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—না, মানে গ্রামের চাষাভুষোদের নিয়ে তার কারবার। তার ওপর এমন একটা অজ পাড়াগাঁয়ে, এক দঙ্গল অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে—সব চেয়ে বড় কথা যেখানে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই, এ পরিবেশে ইন্দুর মত এক প্রাণোচ্ছ্বল মেয়ে কি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে মিঃ রয়?

রে-সাহেব হাসিয়া বলিলেন—মিঃ ঘোষ, অমরনাথ আর ইন্দু কিন্তু মৃতের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করার সুমহান যজ্ঞেরই আয়োজন করেছে। মৃত প্রায় গ্রাম-বাংলার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে ওরা আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ওরা সে বিরাট যজ্ঞের আয়োজন

করেছে, সে মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করেছে আপনি সে মহৎ প্রয়াসে প্রতিবন্ধকতা করতে চাচ্ছেন কিসেব আশায়, কিসের মোহে ?

আপনি তবে ব্যাপারটাকে স্বীকার করে নিতেই উৎসাহ দিচ্ছেন মিঃ রয় ?

অবশ্যই, শুধু তা-ই নয়। অমরনাথ ও ইন্দু যৌথ উদ্যোগে যে যজ্ঞের আয়োজন করেছে তাকে সার্থকতায় পরিপূর্ণ করার জন্য আপনার-আমার মত মানুষের স্বেচ্ছায় এগিয়ে—

পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি নবদম্পতির মঙ্গল হোক, সুখে থাক। আমার স্টেটাস, আমার পজিসন, খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করেও যদি দেশ ও দশের মঙ্গল হয় তবে আমি হাসিমুখে ত্যাগ স্বীকার করছি। দেশের বুকে জাগরণের যে জোয়ার এসেছে তাতে আমার ইন্দুর মত একবিন্দু জল হাসিমুখে আমি উৎসর্গ করলাম।

একুশ

মিঃ ঘোষ সস্ত্রীক অমরনাথের বাড়ি যাইয়া একমাত্র কন্যা ইন্দু ও জামাতা অমরনাথকে আশীর্বাদ করিয়া আসিলেন। অমরনাথও তাহার মায়ের শিষ্টাচার, আন্তরিক আপ্যায়ণ ও অমায়িক আচরণ ঘোষ দম্পতিকে যাহার পর নাই মুগ্ধ করিয়াছে। কমলকিরণ আর আলেখ্যর মন হইতেও বিষাদের কালো মেঘটুকু কাটিয়া যাইয়া স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসিয়াছে। দীর্ঘ চেষ্টার পর ওরা ইন্দুর দেখা পাইয়াছে। ইন্দু ও অমরনাথের বিবাহিতা ছোট বোন সুলোচনার এখন শ্বাস ফেলিবার সময় নাই। মহিলা সমিতির মিটিং, মিছিল আর উন্নয়ণমূলক কাজের পিছনেই তাহাদের সারাদিন কাটিয়া যায়। ইদানিং একটা বড় রকমের কাজে হাত দিয়াছে ওরা। গ্রামে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিছু উপযুক্ত স্থানের অভাবে ওদের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেয়া সম্ভব হইতেছে না।

মিঃ ঘোষ পাটনায় ফিরিয়া যাইবার প্রস্তুতি লইতে লাগিলেন। দীর্ঘদিন কর্মস্থল ছাড়িয়া রে-সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। কর্মের তাগিদ না থাকিলে দুই প্রবীণ বন্ধুতে হাসি-ঠাট্টা-আনন্দেব মধ্যে আরও কিছুদিন কাটাইয়া যাইতেন। কিন্তু সাধ থাকিলেও তাহা পূরণ করিবার সাধ্য তাঁহার কোথায় ?

কমলকিরণ, অমরনাথ ও আলেখ্য স্টেশন পর্যন্ত আসিয়া মিঃ ঘোষ ও মিসেস ঘোষকে ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ইন্দুরও স্টেশনে তাহাদের সহিত মিলিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু মহিলা সমিতির এক জরুরী সভা থাকায় তাহার পক্ষে সময় মত স্টেশনে উপস্থিত সওয়া সম্ভব হয় নাই। পূব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভার কাজ সম্পন্ন হইলে তাহার উপস্থিতির কোন সমস্যাই থাকার কথা নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যাইয়া কর্মপদ্ধতির কিছু রদবদল করিতে হইয়াছে বলিয়াই ট্রেনের সময়ে সময়ে নিজেকে হাল্কা করিতে পারে নাই। কাজের আদর্শগত আকর্ষণের প্রকৃতি

এমনি, বাহিরের জগতের কথা ভুলাইয়া দেয়। সেই আকর্ষণে যারা নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া তাহারই কর্মে সাফল্য লাভ করিতে পারে। কর্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও আদর্শহীনরা সমাজ-সংসারে জোয়ারের জলে খড়কুটার ন্যায় ভাসিয়াই বেড়ায়। পায়ের তলায় মাটি খুঁজিয়া পাইতে পাইতে আয়ু ফুরাইয়া যায়। তাহাদের আসা-যাওয়ার মাঝখানের কয়েকটি বছর বৃথা ব্যয় হইয়া গেল বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

আলেখ্য পোড় খাইয়া খাইয়া ইতিমধ্যে নিজের মনকে অনেক শক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার অন্তরের অন্তরস্থলে একটি চাপা কান্না গুমড়াইয়া বেড়াইতেছে। ছাইচাপা আগুনের ফুলকির মত ভিতরে ভিতরে প্রতিনিয়ত জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহার বহিঃপ্রকাশ নাই। তাহার পিতা বয়সের ভারে অচল হইয়া পড়িয়াছেন। সর্বদা আরাম কেদারায় শরীর এলাইয়া দিয়া বিষণ্ন মনে বসিয়া থাকেন। মাঝেমধ্যে বাহিরের নীল আকাশের দিকে চাহিয়া টুকরা টুকরা মেঘের আনাগোনা দেখিয়া সময় কাটাইয়া দেন। আর কখনও কখনও স্মৃতির পাতা উল্টাইয়া অতীতের সুখ দুঃখের বিচ্ছিন্ন ঘটনা-গুলিকে জোড়া দিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক সৃষ্টি করিবার ব্যর্থ প্রয়াস চালাইতে থাকেন। স্মৃতিশক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে। টুকরা টুকরা কয়েকটি ঘটনা একত্রিত করিতে না করিতে তাহা হইতে দুই-একটি সংগোপনে সরিয়া যায়, লুকোচুরি করে। তাহার জীবন-নাট্য সৃষ্টির বাঞ্ছতা অপূর্ণই রহিয়া যায়। তাহার ভবিষ্যতের ভাবনা নাই। বর্তমান লইয়া একটু-আধটু ভাবিবার অবকাশ যাহাও ছিল, কন্যা আলেখ্য সেই দায় হইতে রে-সাহেবকে অব্যাহতি দিয়াছে। কিন্তু তিনি নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-সুখ উপভোগ করিতেছেন তাহা বলিলে সত্যের অপলাপই করা হইবে। মানুষের জীবনে এমন কিছু সময় আসে যখন সব কথা মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। আবার এমন কিছু সত্য আছে যাহা কাহারো কাছে প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু মুখ বুজিয়া হজম করিতেও কষ্ট হয়, দম বন্ধ হইয়া আসে। বাল্যবন্ধু বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্যের বাড়ি হইতে তিনি সেইদিন যে অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন তাহা কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন নাই। স্রোতস্বিনী নদী যখন পূর্ণ যৌবনের উন্মাদনা লইয়া অগ্রসর হয় তাহার রূপ সৌন্দর্যপিপাসুকে মুগ্ধ করিলেও তাহার স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু 'গ্রীষ্মে' যখন সেই স্রোত-স্বিনীই শুকাইয়া মজিয়া শীর্ণকায় রূপ ধারণ করে, তাহার সেই শোচনীয় পরিনামের কথা কয়জন মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে? তাহা ছাড়া বিশাল এই জগতে প্রতিনিয়ত কত নয়ন গাঙ্গুলিই না জন্মগ্রহণ করিতেছে, মরিতেছেও অগণিত। কিন্তু একটিমাত্র নয়ন গাঙ্গুলির মৃত্যু কেন এমন প্রকট হইয়া রে-সাহেবকে প্রতিনিয়ত রক্তচক্ষু দেখাইতেছে, শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে তাঁহার বুকের ভিতরে নির্মমভাবে হাতুড়ি পিটিতেছে?

আলেখ্য ও কমলাকিরণ কিছু সময়ের জন্য বাড়ির বাহিরে গিয়াছিল। এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। আলেখ্য সোজা তাহার বাবার ঘরে ঢুকিল।

রে সাহেব উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আলেখ্যর উপস্থিতি বুঝিয়াও নিরব রহিলেন। আলেখ্য তাহার বাবার কাছে আসিয়া চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বাবা, জরুরী দরকারে ঘুম থেকে উঠেই বাইরে যেতে হয়েছিল। মনির মা'কে বলা ছিল, সময়মত তোমায় যেন চা-জলখাবার দিয়ে যায়। কিছু খেয়েছিলে?

রে-সাহেব জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন—হাঁ।

তোমার কোন কষ্ট হয়নি ত বাবা?

না, ইন্দু ও অমরনাথ একটু আগে এসেছিল। ঠাকুরের প্রসাদ দিয়ে গেছে। ইন্দু নিজেহাতে আমাকে খানিকটা দিয়ে বাকীটা তোমার আর কমলকিরণের জন্য আলমারিতে রেখে গেছে। ওরা এইমাত্রই গেল। তোমাদের জন্য অনেকক্ষণ—

আলেখ্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া বলিল—তাই নাকি! আর একটু আগে ফিরতে পারলে ওদের দেখা হয়ে যেত।

রে সাহেব ঘাড় ঘুরাইয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—ইন্দু জিজ্ঞেস করছিল মেয়েদের জন্য যে স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, তার কতদূর কি চিন্তা করলেন?

কমলকিরণ ইতিমধ্যে রে সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া চেয়ার টানিয়া বসিয়াছে।

আলেখ্য তাহার পিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া বলিল—বাবা, কমলকিরণের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র তোমার মতামতের অপেক্ষায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে আছে। ইন্দু ও অমরনাথবাবুর ইচ্ছে মেয়েদের স্কুলটা আমাদের চণ্ডী-মণ্ডপ ও তার পাশের ঘর তিনটি নিয়ে প্রথম শুরু করেন।

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া রে-সাহেব কহিলেন—দেশে যে-জাগরণ এসেছে তা থেকে মেয়েদের দূরে ঠেলে রাখলে, অবহেলা অবজ্ঞাভরে বঞ্চিত করলে জাগরণ যে অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে মা আলো। আর আমার মতামতের কথা যদি বল, অনেক আগেই আমি মত দিয়ে রেখেছি। জমিদারি এখন তোমার। তাই ওকে বলেছিলুম, তোমাদের সঙ্গে একবারটি কথা বলে—ফর্মালিটি বলে একটা ব্যাপার আছে যে।

আলেখ্য হাসিয়া বলিল— বাবা তোমরা তলে তলে এতদূরে এগিয়ে গিয়ে—

কমলকিরণও হাসিয়া বলিল—এখন শুধুমাত্র ফর্মালিটিটুকু সারার অপেক্ষায় রয়েছে।

আলেখ্য বলিল—বাবা, দেশে যে জাগরণ এসেছে, আমার সাধ্য কি তাকে প্রতিরোধ করি। নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে, বাঁধ দিয়ে জোয়ারের জল ঠেকাতে, পারলুম কি? এখন ভাবছি, অহেতুক গণদেবতার সঙ্গে বিরোধই সার হ'ল! মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া এইবার বলিল—এতে আমি কিন্তু ঠকিনি বাবা। নিজের স্বার্থটুকু যখের

ধনের মত বুকে করে আগলে রাখার চেয়েও দশজনের সঙ্গে একাসনে বসে ভোগ করার যে কী অনাবিল আনন্দ তা আজ উপলব্ধি করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নইলে সে জীবনে বড় আনন্দ আমার কাছে অনাস্বাদিতই রয়ে যেত। প্রত্যাশাহীন দানের আনন্দ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে।

রে সাহেবের চক্ষু দুইটি আনন্দ উচ্ছ্বাসে জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। তিনি বিস্ময়ভরা চোখে কন্যার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার চোখে আজ আলেখ্য যেন এক নতুন মানুষ। গ্রহান্তর হইতে সদ্য এই গ্রহে তাহার আগমন ঘটিয়াছে। সেই দিনের সেই আলেখ্যর সহিত তার মিল কোথায়? এই আলেখ্যই কি নয়ন গাঙ্গুলির মৃত্যুর পর বলিয়াছিল—গাঙ্গুলি মশাই সম্পূর্ণ কাজের বার হয়ে গিয়েছিলেন। আমার জমিদারি সুশৃঙ্খলায় চালাবার চেষ্টা করা ত আমার অপরাধ নয়।'

আলেখ্য সেইদিন ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাস করেনি, দেশের কোটি কোটি মানুষের সাহত তাহার একটি নিবিড় সম্পর্ক রহিয়া গিয়াছে। যে-শুভবুদ্ধি লইয়া অমরনাথ দেশের মঙ্গলার্থে সহজেই আত্মনিবেদন করিয়াছিল, ক্ষুধিতের কান্নায় উদ্ভ্রান্তের মত ছুটিয়া যাইতে পারিয়াছিল, আলেখ্য স্বার্থপরতাকে নির্দ্বিধায় চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে পারিয়াছিল, তাহার অপব্যয় কি নয়ন গাঙ্গুলির তের টাকা বেতনকে ছাপাইয়া গিয়া অমার্জনীয় নির্লজ্জতাকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে তাহা মুখের উপর শুনাইয়া দিতেও দ্বিধা করে নাই। আলেখ্যর দাম্ভিক মন সেইদিন কোন যুক্তিকেই গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। অবজ্ঞা অবহেলা ভরে সবকিছুকে দুই পায়ে ঠেলিয়া আগাইয়া যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল। একের পর এক আঘাত তাহাকে আজ রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড় করাইয়াছে। সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছে মুষ্টিমেয়র স্বার্থের তাগিদে বৃহত্তর স্বার্থকে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা। ইহাতে স্বার্থরক্ষা হয়ই না বরং তাহাদের দীর্ঘশ্বাস জীবনকে করিয়া তোলে বিষময়। আলেখ্যই আজ কথা প্রসঙ্গে ইন্দুকে আক্ষেপ করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছে—আমি আজ আত্মশুদ্ধির জন্য বড়ই উন্মুখ ইন্দু! অতীতের কলঙ্ককে বর্তমানের শুভকর্মের মধ্য দিয়ে ধুয়ে মুছিয়ে মলিনতা মুক্ত করতে চাই। তুমি আমায় পথ দেখাও, আলোর সন্ধান দিয়ে আমায় রিক্ততার আনন্দটুকু উপলব্ধি করতে দাও। এতদিন আমার মনে এক ভ্রান্ত ধারণাকে সযত্নে পোষণ করেছি। জলসিঞ্চন করে তাকে জিইয়ে রেখেছি। আজ এ-সত্যটুকু উপলব্ধি করলুম, কেবলমাত্র পাওয়ার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সে আনন্দ সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, পরহিতার্থে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেও এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ উপলব্ধি করা যায়। আজ আমি নির্দ্ধিধায় বলছি ইন্দু, তোমরা যে-জাগরণ—যজ্ঞের আয়োজন করেছ তাতে আমার আভিজাত্যের গর্ব, আত্মাভিমান আর শিক্ষার অহংকারটুকু আহুতি দেবার সুযোগ দাও। আমার মনের গ্লানি আর খাদটুকু জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাক। আমায়

তোমাদের সে-সুমহান যজ্ঞের অংশীদার করে নাও ইন্দু।

ইন্দু বলিয়াছিল—আমি জানতুম, অশিক্ষার অভিশাপ যাদের অন্ধকার অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, অর্দ্ধাহার আর অনাহারে যাদের কঙ্কালসার দেহ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে, যাদের জীবনেতিহাস লাঞ্ছনা আর প্রবঞ্চনার গুটিকয়েক পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আর ফুসফুস যাদের নিরবচ্ছিন্ন হাহাকার আর হাহুতাশে ভরপুর—যেদিন নির্দ্বিধায় তাদের সঙ্গে একাসনে বসতে পারবে, তখনই বুঝবে তোমার অন্তরের মালিন্যটুকু ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভাল করে ভেবে দেখ, সময় নাও। ভুলে যেয়োনা সেদিনই পুনর্জন্ম হবে তোমার। আরও একটা কথা, দেশ ও দশের কল্যাণার্থে আবেগ বশে এগিয়ে আসতে পারে অনেকেই, কিন্তু টিকে থাকা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না, জেনো। যেদিন নিজের বৃহৎ স্বার্থকে অপরের কল্যাণে স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দিতে পারবে সেদিনই বুঝবে তোমার মনের গভীরে, ফল্গুধারা বইতে শুরু করেছে। এখনই তোমার সামনে বৃহত্তর স্বার্থের দরজা খুলে যাবে, ঘটবে সুপ্ত আত্মার নব জাগরণ।

আলেখ্য আজ আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে বৃহত্তের মাঝে বিলিয়ে দিবার জন্য উন্মুখ। উচ্ছ্বাসে, আনন্দে সে আত্মহারা। মুখে হাসির ঝিলিক ফুটাইযা পিতার মুখোমুখি বসিল। তাহার আকস্মিক পরিবত নটুকু তাহার পিতা রে-সাহেবের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি বলিলেন—মা আলো, কিছু বলবে আমায় ?

আলেখ্য উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—বাবা, ভুল মানুষ মাত্রেই করে। আমিও ভ্রান্ত ধারণার পিছনে কম ছুটোছুটি করিনি। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে আমার আভিজাত্যের গর্ব শিক্ষার অহঙ্কার, বংশমর্যাদা আজ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আজ আমার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটেছে,। আমার ভুল শোধরাবার জন্য আজ আমি অস্থির চঞ্চল। আমার এই এতটুকু বয়সে যে ভুলের পাহাড় গড়ে তুলেছি তার কতটুকু শোধরাতে পারব, জানি না।

রে-সাহেব কহিলেন—অনুশোচনার জ্বালায় দগ্ধ হয়েই মানুষের আত্মিক বিকাশ ঘটে আলো।

আলেখ্য কহিল—আমি মনস্থির করে ফেলেছি বাবা, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার এক তিলের ওপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য যেটুকু রেখে অবশিষ্ট যাবতীয় সম্পত্তি দেশ ও দশের স্বার্থে আমি অমরনাথবাবুর হাতে তুলে দেব ভেবেছি। আমার সম্পত্তি স্বদেশী আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করার কাজে ব্যয় হোক, এ-মুহূর্তে এটাই আমার ঐকান্তিক আগ্রহ।

তোমার মনে যে শুভবুদ্ধির সঞ্চার হয়েছে তাতেই আমি আনন্দিত। অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি জানতুম মা আলো, আজ না হোক কাল তোমার অন্তরের মালিন্যটুকু অনুতাপের জ্বালায় দগ্ধ হবেই।

বাবা, অশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে বিদ্যালয় স্থাপন, পানীয় জলের কষ্ট নিবারণের

জন্য পুষ্করিণী ও দীঘি খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি মাঙ্গলিক কাজের জন্য আমাদের সম্পত্তির সিংহভাগ দানপত্র তৈরী করে এনেছি, এই দেখো, কয়েকটি কাগজ রে-সাহেবের হাতে তুলিয়া দিয়া এইবার বলিল—এগুলোতে স্বাক্ষর করে দাও বাবা।

বৃদ্ধ রে-সাহেব উচ্ছ্বসিত আবেগের সহিত বলিলেন—মা আলো, বহু দেরীতে হলেও তোমার মনে যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে তাতে আমি আন্তরিক অভিনন্দিত। আজকের এ-শুভমুহূর্তে তোমায় ধন্যবাদ না জানালে নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে হবে মা। আজ দেশের বুকে যে-জাগরণের শুভ উদ্বোধন হ'ল তাতে তোমার এ-সহযোগিতাটুকু খুবই সামান্য হলেও আন্তরিকতায় ভরপুর। তুমি যে নিজেকে গ্রামের অসহায় আর্ত, লাঞ্ছিত ও প্রপীড়িত মানুষগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশিয়ে দিতে পেরেছ এটুকুতেই আমার শান্তি। মৃত্যুর আগে এ শান্তিটুকু পেয়ে গেলুম মা, দেশের বুকে আজকে জাগরণের জোয়ার বইছে। তাতে তুমিও নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছ। দানপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাহা পুনরায় আলেখ্যর হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে রে-সাহেব বলিলেন—মা আলো, তোমাদের জাগরণের পবিত্র-যজ্ঞে এ-বুড়ো মানুষটার একটা আন্তরিক ইচ্ছা কি স্থান পেতে পারে না?

আলেখ্য অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করিল—কি? কি সে-ইচ্ছা বাবা?

রে-সাহেব চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন তুমি একটু আগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বললে না।

হ্যাঁ বাবা, আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ ও প্রাসাদের কিছু অংশ নিয়ে একটা হাই-স্কুল গড়ে তুলব ভেবেছি।

আমার ইচ্ছে, তার নামকরণ করা হোক—'নয়ন গাঙ্গুলি বিদ্যানিকেতন'।

তাই হবে বাবা। এর মধ্য দিয়ে আমার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত না হোক, স্বস্তি পাবো। স্কুলের নামকরণ করব 'নয়ন গাঙ্গুলি বিদ্যানিকেতন'। আলেখ্য ও কমলকিরণ রে-সাহেবকে প্রণাম করিয়া দানপত্র হাতে অমরনাথের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

সমাপ্ত

---

* 'জাগরণ'—উপন্যাসের প্রথম 'নয়' পরিচ্ছেদ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত। বাকি অংশ সম্পূর্ণ করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী সুবোধ চক্রবর্তী।

—প্রকাশক